দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

৬৬ বর্ষ, ৩৫ সংখ্যা ।। ১২ মে - ২০১৪ ।। ২৮ বৈশাখ - ১৪২১ ।। website : www.eswastika.com

ভারত শুধু বাঙালি হিন্দুর নয়, নির্যাতিত সব হিন্দুরই আশ্রয়স্থল

পৃঃ - ১২

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

নির্বাচন কমিশন পশ্চিমবঙ্গে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট পরিচালনায় সফল হয়নি □ গূঢ়পুরুষ □ ১০

খোলা চিঠি : হরিদাসের বুলবুল ভাজা, টাটকা তাজা... □ সুন্দর মৌলিক □ ১১

ভারত শুধু বাঙালি হিন্দুর নয়, নির্যাতিত সব হিন্দুরই আশ্রয়স্থল □ নবারুণ দে □ ১২

ইউ পি এ সরকার হারতে চলেছে □ নবকুমার ভট্টাচার্য □ ১৪

প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য একমাত্র নরেন্দ্র মোদীই যোগ্য কেন? □ নবকুমার আদক □ ১৬

আমার আপনার দুর্দিনে গণতন্ত্রের কি আসে যায়! □ সমীর কুমার পড়্যা □ ২০

চিরনূতনকে ডাক দেওয়া পঁচিশে বৈশাখ □ চতুর্থ পাণ্ডব □ ২১

কুরুক্ষেত্রের সূর্যগ্রহণ মেলা □ শুভাপ্রসন্ন মণ্ডল □ ২২

পৌরাণিক নগর : বৃন্দাবন □ গোপাল চক্রবর্তী □ ২৩

সীমান্তের ওপারেও মোদী-লহর □ মুজফ্‌ফর হোসেন □ ২৭

কে হবেন প্রধানমন্ত্রী? □ ডঃ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত □ ২৯

দিল্লীতে মোগল শাসনের মৃত্যুঘণ্টা কি বাজল? □ ড. দীনেশচন্দ্র সিংহ □ ৩১

ব্রহ্মা-নারদ সংবাদ : বিষয় নরেন্দ্র মোদী □ কল্যাণ ভঞ্জ চৌধুরী □ ৩২

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯ □ □ নবাঙ্কুর : ২৪-২৫ □ □ অঙ্গনা : ২৬ □

অন্যরকম : ৩৩ □ □ পুস্তক প্রসঙ্গ ৩৫ □ □ সমাবেশ-সমাচার : ৩৬-৩৮

□ □ রঙ্গম : ৩৯ □ □ শব্দরূপ : ৪০ □ □ চিত্রকথা : ৪১

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৬ বর্ষ ৩৫ সংখ্যা, ২৮ বৈশাখ, ১৪২১ বঙ্গাব্দ

যুগাব্দ - ৫১১৬, ১২ মে - ২০১৪

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

বিশেষ রচনা ১৪ - ১৮

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

সার্কুলেশন : ৭২৭৮৪১৭৩১৬
৮৬৯৭৫২১৪৭৯

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

Postal Registration No.-
Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

প্রকাশিত হবে ১৯শে মে ২০১৪

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার বিশেষ বিষয়

প্রকাশিত হবে ১৯শে মে ২০১৪

মোদীর ভাবনা-চিন্তা

আগামী ১৯শে মে ২০১৪ সংখ্যা যখন প্রকাশিত হবে, লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল তখন সকলের জানা। বিজেপি-র প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী নরেন্দ্র মোদীর বিভিন্ন বিষয়ে যেমন অর্থনীতি, পরিবেশ, প্রতিরক্ষা, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, এমনকী পাকিস্তান, চীন ও আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে তিনি যে ভাবনা-চিন্তা প্রকাশ করেছেন, সেটাই এবারের বিষয়।

HB ®
INDIA'S NO. 1 IN
ISI MARKED
HEAVY PIPE FITTINGS
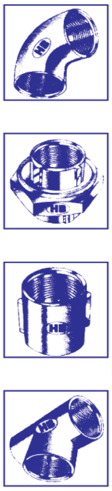
HB ® AN ISO 9002 CERTIFIED CO.
Authorised Distributor
NATIONAL PIPE & SANITARY STORES
54, N. S. Road
Kolkata-700001
Ph : 2210-5831/5833
3, Jadu Nath Dey Road,
Kolkata-12, Ph. 2215-6804,
Fax : 2212-2803
Sister Concern
Partha Sarathi Ceramics
4, College Street,
Kolkata-700012
Ph: 2241 6413 / 5986
Fax : 033-22256803
e-mail : nps@vsnl.net
website ;
www\nationalpipes.com

সানরাইজ ®
শাহী
গরম
মশলা

SUNRISE PURE ®
রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

মোদী যথার্থ : অনুপ্রবেশকারীদের ফিরিতেই হইবে

বিজেপি 'অনুপ্রবেশকারী খেদাও'-এর ডাক দিয়াছে বলিয়া পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বাজার গরম করিবার চেষ্টা করিতেছেন; তাঁহার পোঁ-ধরা কাগজগুলিও একই অপপ্রচার করিতেছে। মৌচাকে ঢিল পড়িলে রাগ হইবারই কথা। শ্রীরামপুরের জনসভায় নরেন্দ্র মোদী এবং পরে পশ্চিম-মেদিনীপুরে রাজনাথ সিং যাহা বলিয়াছেন তাহাতে জামাতে ইসলামির দালালদের রাগ তো হইবেই। বিজেপি প্রথম হইতেই বলিতেছে হিন্দুরা শরণার্থী এবং অহিন্দুরা অনুপ্রবেশকারী। এ বিষয়ে রাজ্যের মানুষের নিকট পরিকল্পিতভাবে এক ভ্রান্ত প্রচার চালাইতেছে সংখ্যালঘু ভোটলোভী রাজনৈতিক দলগুলি। পশ্চিমবঙ্গের বাংলাদেশ সীমান্তে অনুপ্রবেশ হইতেছে বহুদিন ধরিয়া। অনুপ্রবেশকারী মুসলমানের দাপটে মুর্শিদাবাদে হিন্দু বাঙালি সংখ্যালঘু হইয়া গিয়াছে। মালদহে সংখ্যালঘু হইবে অচিরেই। নদীয়া এবং দুই ২৪-পরগণাতে আগামী দশ বছরের মধ্যে বাঙালি হিন্দুরা সংখ্যালঘু হইয়া যাইবে। সংখ্যালঘু ভোটের কাঙাল বামফ্রন্ট দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর ধরিয়া এই অনুপ্রবেশকারীদের রেশনকার্ড, ভোটার কার্ড তৈরি করিয়া দিয়াছে, ক্ষমতা পরিবর্তনের পর তৃণমূল সরকারও একই বৃন্তে দুটি কুসুম স্লোগান দিয়া একই কাজ করিতেছে। সরকারের এই তোষণের ফলে সীমান্তে অপরাধ এবং অপরাধচক্র বৃদ্ধি পাইয়াছে। জালনোট, সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ এই স্থান হইতেই সমগ্র ভারতে সক্রিয় ভাবে চালাইতেছে। অনুপ্রবেশকারীরা স্থানীয় জাতভাইদের সহায়তায় হিন্দুদের ফসল লুঠ করিতেছে, হিন্দু-মেয়েদের ইজ্জত নষ্ট করিতেছে, গবাদি পশু চুরি করিয়া বাংলাদেশে পাচার করিতেছে। ভারতীয় এলাকায় বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীরা তাহাদের দখল এতটাই কায়েম করিয়া ফেলিয়াছে যে এদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীও সেই দখল শিথিল করিতে পারিতেছে না। স্মরণ করা প্রয়োজন, এককালে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলি কায়েম করিবার স্বার্থেই পাকিস্তানের দাবি উঠিয়াছিল। আজও একইভাবে বাংলাদেশী মুসলমান অনুপ্রবেশকারী দখলীকৃত এলাকা কায়েম করিবার জন্য 'মুঘলস্থান', 'বৃহত্তর ইসলামিক বাংলাদেশ' গঠনের দাবি শোনা যাইতেছে। কারণ বাংলাদেশ সীমান্তের ভারতীয় এলাকাগুলিতে এত বেশি অনুপ্রবেশকারী বসতি স্থাপন করিয়াছে যে ওইসব এলাকাগুলি কার্যত ভারতের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলিয়া গিয়াছে। বিজেপি এই অনুপ্রবেশকারীদের বহিষ্কারের কথা বলিতেছে, কিন্তু সংখ্যালঘু ভোটের কাঙাল রাজনৈতিক দলগুলি এই বিষয়কে উপলক্ষ করিয়া শুরু করিতেছে বাঙালির স্বার্থরক্ষার নামে এক বিপজ্জনক রাজনীতি।

গত একশত বছরের ইতিহাসে যে ব্যক্তির নিকট বাঙালি ঋণী তিনি ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। দেশভাগের পর পূর্ববঙ্গ হইতে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু যখন এই রাজ্যে চলিয়া আসিল তখন তাঁহাদের সেবক রূপে শ্যামাপ্রসাদ দাঁড়াইয়াছিলেন। কমিউনিস্টরা এই উদ্বাস্তুদের ব্যবহার করিয়া ভোটব্যাঙ্ক স্ফীত করিয়াছিল। আজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও উদ্বাস্তুদের সহিত প্রতারণা করিতেছেন। বাংলাদেশ হইতে আজও হাজার হাজার হিন্দু বাঙালি জামাতে ইসলামির অত্যাচারে শরণার্থী হইয়া এদেশে বাধ্য হইয়া চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সরকার এই হিন্দু শরণার্থীদের কথা না ভাবিয়া জামাতে ইসলামিকে এই দেশে আমন্ত্রণ জানাইতেছে; তাহাদের প্রতিনিধিকে রাজ্যসভার সদস্য করিয়াছে। বহু পূর্বেই পশ্চিমবঙ্গের ভূতপূর্ব রাজ্যপাল টি ভি রাজেশ্বর রাও এই বলিয়া সতর্ক করিয়াছিলেন যে, ভারত যদি বাংলাদেশ সীমান্ত হইতে আসা ব্যাপক অনুপ্রবেশ বন্ধ না করিতে পারে তাহা হইলে ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলে অপর একটি বাংলাভাষী মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র সৃষ্টি হইবে। নরেন্দ্র মোদীর বক্তব্য এই বাংলাভাষী মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র গঠনে প্রধান বাধা স্বরূপ। তাই তাঁহার নামে এত কুৎসা চলিতেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি ওই ইসলামিক স্থানের দালাল? তাঁহার বক্তব্য রাষ্ট্রবিরোধী। এমন একজন ব্যক্তির মুখ্যমন্ত্রী পদে থাকিবার অধিকার আছে কিনা তাহা ভাবিবার বিষয়। এই ব্যক্তি মুখ্যমন্ত্রী থাকিলে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা কতটা রক্ষিত হইবে তাহাও চিন্তার বিষয়।

সুভাষিত

জন্মস্থানং মহর্ষীণাং তপস্থানঞ্চ যোগিনাম্।
ন জগদ্বন্দ্যতাং রাষ্ট্রং ভজেৎ সঙ্ঘবলং বিনা।।

দেশের অধিবাসীদের শক্তিশালী সংগঠন যদি না থাকে তাহলে কেবলমাত্র মহাপুরুষদের জন্মস্থান অথবা যোগী-ঋষিদের তপোভূমি হলেই কোনও রাষ্ট্রকে পৃথিবীর লোকেরা সম্মান করে না।।

কংগ্রেসের মন্ত্রী মনীশ তেওয়ারী কাদা ছুঁড়তে গিয়ে মেখে ফেললেন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভেবেছিলেন ভোটের বাজারে নিজের দলের প্রায় সবাই যখন কোনো না কোনো কেলেঙ্কারি নিয়ে বুঁদ হয়ে আছে তখন কেলেঙ্কারি হয়তো জাতীয় পেশাই হয়ে গেছে। এই ভেবে তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী কংগ্রেসের মনীশ তেওয়ারী তাঁর দলের অশোক চৌহ্বান (আদর্শ আবাসন খ্যাত) প্রমুখের সঙ্গে প্রাক্তন বিজেপি সভাপতি নীতিন গডকরির নামটাও জুড়ে দিয়েছিলেন।

প্রাক্তন বিজেপি সভাপতি গডকরিকে কুখ্যাত আদর্শ আবাসন কেলেঙ্কারির সঙ্গে যুক্ত থাকার দায়ে মনীশ তেওয়ারি অভিযুক্ত করেছিলেন। অভিযোগটি পুরনো ২০১০ সালের। কিন্তু ভোটের বাজার গরম করতে কংগ্রেস সেটিকে প্রায়ই প্রচারে তুলে ধরত। উল্লেখ্য, গডকরি নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে পত্রপাঠ মানহানির মামলা দায়ের করেন মুম্বাই-এর অতিরিক্ত মুখ্য মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রের আদালতে। এই মামলা চার বছর চলার পর মনীশ তেওয়ারী কোর্টের নির্দেশে প্রায় গলবস্ত্র হয়ে গডকরির কাছে লিখিত ক্ষমা প্রার্থনা করে অর্থদণ্ড থেকে মুক্তি পেয়েছেন। সেই সময় গডকরি তাঁকে বিবৃতি প্রত্যাহার করে ক্ষমা চাইতে বলেছিলেন। তেওয়ারী কোনো গুরুত্ব না দেওয়ার গডকরি ফৌজদারী আদালতে মানহানির মামলা করেন। ঘাম ছুটে গেছে কংগ্রেসের এই সবজান্তা মহাপণ্ডিত মন্ত্রীর। তাঁর ক্ষমাপত্রে লিখেছেন "I state that in future, I will never put you in disrepute by making any Comments regarding Adarsh. By this Communication... I tender my unconditional apology for the allegations made by me."

ঠেলার নাম বাবাজী। কংগ্রেসীরা এই রকম কত শত চাল-বেচাল অভিযোগ সর্বোচ্চ পদাধিকারীদের বিরুদ্ধে এনে এবার ভোটযুদ্ধ পেরোতে চেয়েছিল তা নিয়ে পৃথক গবেষণা হতে পারে।

জামনগরের কংগ্রেস প্রার্থীর হারার আগেই হার স্বীকার

বিক্রম মাদাম

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গুজরাটের জামনগরের সাংসদ তথা এবাবের লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী বিক্রম মাদাম ফল প্রকাশের আগেই হার স্বীকার করে নিয়েছেন। উপকূলবর্তী জামনগর লোকসভা নির্বাচন কেন্দ্রে তিনি তাঁর ভাইঝি খাম্বালিয়া বিধানসভার বর্তমান বিজেপি বিধায়ক পুনম মাদাম-এর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিলেন। সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে তিনি জানান, কমপক্ষে ২০ হাজার ভোটে তিনি বিজেপি প্রার্থীর কাছে পরাজিত হবেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জামনগরে মাদাম পরিবারের বেশ রাজনৈতিক প্রভাব রয়েছে। বিক্রমের বড় ভাই তথা পুনমের বাবা হেমন্ত মাদাম জামনগরের মেয়র এবং কংগ্রেসের বিধায়ক। বিক্রম নিজেও এই কেন্দ্র থেকে কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে ২০০৪ ও ২০০৯-এ লোকসভা নির্বাচনে জয়ী হয়েছিলেন।

নরসিমা রাও-এর সঙ্গে বাহাদুর শাহের মতোই অমানবিক আচরণ করেছে কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী পিভি নরসিমা রাও-কে শেষ মোগল বাদশা বাহাদুর শা জাফরের সঙ্গে তুলনা করলেন বিজেপি-র প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী নরেন্দ্র মোদী। গত ১ মে উপকূলবর্তী অন্ধ্রের গুন্টুরে এনডিএ-র এক নির্বাচনী সভায় নরসিমা রাও-এর সঙ্গে সোনিয়া গান্ধী ও তাঁর পুত্র রাহুল গান্ধীর অমানবিক আচরণের কথা উল্লেখ করে শ্রীমোদী বলেন, দিল্লীতে রাও-এর স্মৃতি রক্ষার জন্য এক টুকরো জমি দিতে তাঁরা অস্বীকার করেছিলেন।

শ্রীমোদী বলেন, বৃটিশের বিরুদ্ধে বাহাদুর শা জাফর স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর বৃটিশ সরকার তাঁর স্মৃতিরক্ষার জন্য এক খণ্ড জমি দিতে রাজি হয়নি। শেষ মোগল বাদশাহকে শেষ পর্যন্ত রেঙ্গুনে (বার্মা) কবর দেওয়া হয়েছিল। নরসিমা রাও এদেশের অর্থনৈতিক সংস্কারে উদ্যোগ নিয়েছিলেন। সারা জীবন কংগ্রেসের কাজেই উৎসর্গ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর শবদেহ কয়েক মিনিটের জন্য দিল্লীর কংগ্রেস অফিসে পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার অনুমতি এই মা-ছেলেদের সরকার দেয়নি। সুযোগ পেলে তেলুগুভাষী মানুষদের এই অপমানের জবাব দেওয়া উচিত।

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ
সাপ্তাহিক
স্বস্তিকা
গ্রাহক হোন, গ্রাহক করুন
বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৪০০ টাকা

যাদবপুর কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থীর বৈবাহিক অবস্থান নিয়ে ধোঁয়াশা ?

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ডঃ সুগত বসু একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত। প্রেসিডেন্সির এই প্রাক্তনী ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের মেন্টর বা দণ্ডমুণ্ডের কর্তাও ছিলেন সেদিন অবধি। অক্সফোর্ড হার্ভার্ডে শিক্ষিত ডঃ বসুর দাদু ভারত-গৌরব নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর দুঃসাহসিক জীবনভিত্তিক 'His Majesty's apponent-- India's struggle aginst empire' নামের বইটি ভারতে যতটা না পরিচিত সারবিশ্বে বহুল সম্প্রচারিত। এর মূলে রয়েছে শ্রী বসুর অক্লান্ত বিশ্বজোড়া প্রচার। বিতর্কিত বইটিতে একটা বিষয় নিশ্চিত করার ওপর তিনি নানান তথ্য সমাবেশ ঘটিয়ে ছিলেন। সেটি হলো নেতাজীর মৃত্যু। যদিও আজ ভারতবাসী মাত্রই জানেন তৎকালীন বৃটিশ সরকার ও পরবর্তী নেতৃত্বের কংগ্রেস সরকার নিজ নিজ স্বার্থেই নেতাজীর তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যুর বিতর্কিত ও পরবর্তীকালে নানান বিশিষ্ট গবেষকদের গবেষণায় বাতিল হওয়া সংবাদটিকেই গ্রহণ করেছিল। এক্ষেত্রে প্রসঙ্গটি উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে সুগতবাবুও নেতাজী মৃত্যুর এই তথ্যটিকে মেনে নিয়ে তাকে মান্যতা দিতে জানপ্রাণ লড়িয়ে দিয়েছিলেন। স্বার্থের কারণে অনেক জানা অজানা তথ্যই ইতিহাসবিদদের চেষ্টায় পুনরুদ্ধার হয়। সত্য সামনে আসে। ডঃ বসুর ব্যক্তিগত জীবন আলোচনার কোনো ঔৎসুক্য থাকা হয়তো সমীচীন নয়। তবুও তিনি যেহেতু আজ একজন জননেতা এবং তাঁর দলের নেত্রী নানান সভায় সদম্ভে বিজেপি-র প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী নরেন্দ্র মোদীর ৪৫ বছর আগে বিবাহবিচ্ছিন্না (আইনত অর্থে নয়) ধর্মপ্রাণ যশোদাবেনকেও রেয়াত করছেন না। নির্লজ্জ আক্রমণ করে বলছেন যে ব্যক্তি

সুগত বসু ও আয়েশা জালাল

(মোদী) নিজের স্ত্রীর যত্ন নেন না সে দেশ সামলাবে কি করে? শুধু তাই নয়, কংগ্রেসের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার করুণ স্বপ্নবাহক রাহুল গান্ধীও প্রচারের প্রথমদিকে একই প্রশ্ন তুলেছিলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতেই উইকিপিডিয়ার তথ্যগুলির সত্যমিথ্যে সামনে আসা উচিত। যে ব্যক্তি দেশের সর্বোচ্চ আইনসভায় প্রতিনিধিত্ব করবেন তাঁর সঙ্গে পাকিস্তানি নাগরিক হামিদ জালালের কন্যা পাকিস্তানি- আমেরিকান আয়েষা জালালের সম্পর্ক কি? সুগতবাবু তাঁর লোকসভার মনোনয়নপত্রে যে তথ্য দিয়েছেন তাতে তার স্ত্রীর কোনো উল্লেখ করেছেন কিনা এগুলি ভোটদাতা বা জনগণের জানার অধিকার আছে। অধিকাংশ প্রার্থীই তাঁদের স্ত্রী পরিবার নিয়ে প্রচার করছেন। wikipidia'র খাপছাড়া তথ্য অনুযায়ী--- আয়েষা জালাল একজন বিদুষী ইতিহাসবিদ। রক্ত সম্পর্কে প্রখ্যাত উর্দু গল্পকার অকালমৃত সাদ্দাত হোসেন মান্টোর নাতনি। তিনি তাঁর গবেষণায় ডঃ সুগত বসুকে পার্টনার রেখেছিলেন। সূত্র অনুযায়ী পরবর্তীকালে তাঁরা বিবাহিত হন। তিনি তাঁর স্বামী সুগত বসুর সঙ্গে যৌথভাবে কয়েকটি বইও লেখেন। এই সংবাদ অনেক পুরনো— গত ২৭.৮.১১'র পাকিস্তানের Daily Mirror পত্রিকায় সবিস্তারে প্রকাশিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ডঃ বসুর মাতা ডঃ শ্রীমতী কৃষ্ণা বসুর সঙ্গে শ্রীমতী আয়েষা জালাল ওরফে আয়েষা বসু ও স্বামী সুগতর ছবিও অনেক আগেই প্রকাশিত হয়েছে। এসব কোনোটিই দোষের নয়।

কিন্তু সব কাজগুলি যথাযোগ্য স্থানে উল্লেখিত হয়ে থাকলে বলার কিছু নেই। নইলে ৬৭ বছরের বিপত্নীক কংগ্রেসী পুরুষোত্তম, ন্যায়াধীশ দিগ্বিজয় সিং-এর মতো গোপনে ৪০ বছরের অমৃতা রাই-এর রসালো কেচ্ছার মতো ছেনতাই হওয়ার পর যদি সামনে আসে সেটা লোকসভা প্রার্থীর পক্ষে শোভন নয়।

পরিসংখ্যানই বলছে কৃষিক্ষেত্রে সব রাজ্য থেকে এগিয়ে গুজরাট

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান দপ্তর (সি এস ও) জানিয়েছে যে, গত এক দশকে গুজরাট কৃষিক্ষেত্রে অবিশ্বাস্য উন্নতি করেছে। ২০০০ সালে জাতীয় গড় যেখানে ৩.৩ তা থেকে তিন গুণেরও বেশি ৯.৮ হয়েছে গুজরাটের কারণে। কয়েকটি ইংরেজি সংবাদপত্রেও কৃষিক্ষেত্রের এই উন্নতিকে বিকাশের সূচক অঙ্ক লেখা হয়েছিল। 'ইন্ডিয়ান কাউসিল ফর রিসার্চ অন ইন্টারন্যাশনাল ইকনোমিক রিলেসানস্'- এর দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক অধ্যাপক অশোক গুলাটি একটি তথ্যে উল্লেখ করেছেন যে, কৃষিপ্রযুক্তির নিরন্তর উন্নয়ন, বর্ষাকালে জল সংগ্রহ করে ভুগর্ভের জলস্তর বৃদ্ধি, সেচের জন্য কৃষকদের নিয়মিত বিদ্যুতের যোগান ইত্যাদি কারণে গুজরাট সরকার এই অবিশ্বাস্য উন্নতি করতে সফল হয়েছে। ২০০০ সালে গুজরাটের পর রাজস্থান (৯.৬) দ্বিতীয়, ছত্তিশগড় (৮.৯) তৃতীয় এবং মধ্যপ্রদেশ (৭.৪) চতুর্থ স্থানে আছে। এগুলি সবই বিজেপি শাসিত রাজ্য। 'সেকুলার' দলগুলি শাসিত রাজ্য উত্তরপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, পশ্চিমবঙ্গ ও কেরলের অবস্থা খুবই খারাপ। প্রথম তিনটি রাজ্যে কৃষি উন্নতির হার ৩ শতাংশেরও কম।

গুজরাট মডেল ও গুজরাটের কৃষিবিকাশ নিয়ে যারা কথায় কথায় প্রশ্ন খাড়া করে এই তথ্য তাদের মুখে ঝামা ঘসে দিয়েছে।

মুসলমান সন্ত্রাসবাদ এবার জার্মানিতে

সংবাদদাতা॥ মুসলমান সন্ত্রাসবাদ থাবা বসায়নি এমন দেশের সংখ্যা খুবই কম। প্রথম থেকেই তাদের লক্ষ্য ভারত বা তার পার্শ্ববর্তী দেশগুলির ওপর। এছাড়াও বিদেশের মাটিতেও সন্ত্রাসবাদের কবলে পড়ে প্রাণ দিতে হয়েছে বহু মানুষকে। আর এবার সন্ত্রাসবাদীর কবলে জার্মানিও।

উর্দু দৈনিক সালার-এ প্রকাশিত এক খবরে জানা যাচ্ছে জার্মানির বন শহরের (আগের পূর্ব জার্মানির রাজধানী) সেন্ট্রাল রেলওয়ে স্টেশনে বোমা পুঁতে রাখা হয়। এই ঘটনায় পুলিশ চারজনকে গ্রেফতার করে। পুঁতে রাখা বোমায় বিস্ফোরণ না ঘটলেও বছর ২৬-এর জার্মান নাগরিক মারকোজি নামক এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে পুলিশ। মাকোজিকে জেরা করে পুলিশ আরও তিন ব্যক্তির সন্ধান পায়। যাদের চিহ্নিত করে গ্রেফতার করে পুলিশ। পুলিশি জেরায় তারা স্বীকার করে যে পুঁতে রাখা বোমায় মুসলমান বিরোধী এন আর ডব্লিউ-এর প্রধানকে তারা মারতে চেয়েছিল। আর সেই জন্য চারটি বন্দুকও কেনা হয়। সেই সঙ্গে তারা আরও জানায়, তারা একটি মুসলমান সন্ত্রাসবাদী দলের সঙ্গে যুক্ত।

অন্ধ্রের ফেডারেশন অফ চার্চ সেকুলার নেতাদের ভোট দিতে বলছে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ মুম্বাই সেন্ট জেভিয়ার্স-এর অধ্যক্ষ ফ্রেজার ম্যাসকারান-এর পর অন্ধ্রপ্রদেশ ফেডারেশন অফ চার্চেস তাদের সদস্যদের সেকুলার নেতাদের ভোট দিতে বলেছে। বিশপ ও চার্চ-এর প্রধানদের ফেডারেশন এই প্রথম ডাকযোগে চিঠি পাঠিয়ে সাম্প্রদায়িক শক্তিকে রোখার আর্জি জানিয়েছে। ওয়াকিবলাহ মহলের মতে, ফেডারেশন এভাবে কৌশলে জগমোহন রেড্ডির ওয়াই এস আর কংগ্রেসকে ভোট দেওয়ার জন্য আর্জি জানাচ্ছে। জগমোহন রেড্ডির পরিবার খৃস্টান ধর্মাবলম্বী। এবারে ওয়াই এস রেড্ডির স্ত্রী ও জগমোহনের মা বিজয়লক্ষ্মী অন্ধ্রে এবারের লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থী টিডিপি- বিজেপি জোট হওয়ার এরা পরাজয়ের আশঙ্কা বোধ করছে। সারা দেশে যেভাবে মোদী-হাওয়া ক্রমশ প্রবল হচ্ছে তাতে এরা খুবই উদ্বিগ্ন।

গত ৪ সীমান্ধ্রের সকল চার্চে এই চিঠি পড়ে অনুগামীদের শোনানো হয়েছিল। এই চিঠিতে বলা হয়েছে— এমন নেতাদেরই নির্বাচিত করা দরকার যারা জনসাধারণের কাছের লোক ও তাদের অভাব-অভিযোগ দূর করতে পারে।

জনজাতি দলিত, বিশেষত দলিত খৃস্টানদের সামাজিক ন্যায়বিচার ও সমান অধিকার পেতে এরা সাহায্য করে।

শতাধিক বই নিষিদ্ধ সৌদি আরবে

সংবাদদাতা॥ ব্যাঙ্গালোর থেকে প্রকাশিত উর্দু দৈনিক সালার (১৮ মার্চ, ২০১৪) থেকে জানা যাচ্ছে, সৌদি আরব সরকার দেশের ৫০০টি বইকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। কারণ সূত্র মারফৎ সরকার জানতে পারে এই বইগুলি মূলত ইসলাম বিরোধী এবং সন্ত্রাসবাদকে প্রশ্রয় দেয়। নিষিদ্ধ বইগুলি ইসলাম অধ্যুষিত দেশগুলি থেকেই মুদ্রিত এবং বেশিরভাগ লেখক মুসলমান। তবে সৌদি সরকার বইগুলিকে বন্ধ করার কারণ হিসাবে জানা যায় মূলত বইগুলির লেখকরা উদার (লিবারেল) এবং সৌদি আরবের চরমপন্থী নীতির বিরোধী। পাশাপাশি ইসলামি জিহাদি বইগুলিকেও নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। রিয়াধের একটি বইমেলায় ৪২০টি বইয়ের ১০ হাজার কপি বিক্রি আটক করা হয়। ওই বইগুলির মধ্যে আরবীয় কবি ট্রাভেশ-এরও বই আছে। সেই সঙ্গে আবদুল্লা সালামির বইও নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

তাঁর লেখা বই-এর নাম 'হোয়েন উইল সৌদি ওম্যান উইল ড্রাইভ এ কার'। যে দেশে মহিলাদের বোরখা ছাড়া বাইরে পা ফেলার নিয়ম নেই সেখানে সৌদি আরবের নিষিদ্ধ বিষয়ের প্রতি মহিলাদের উৎসাহ দিচ্ছেন। এই সমস্ত বইয়ের পাশাপাশি ইসলামে হিজাব এবং জিহাদ-এর ইতিহাস সম্পর্কিত বিভিন্ন বইগুলিও নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের এক চাঁই-কে ভারতের হাতে সমর্পণ করলো আরব আমিরশাহি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের এক সক্রিয় ক্যাডারকে গ্রেপ্তার করে আরব আমিরশাহি কর্তৃপক্ষ ভারতের হাতে সমর্পণ করেছে গত ২ মে। উত্তরপ্রদেশের আজমগড়ের বাসিন্দা এই জঙ্গির নাম ফৈজান আহমেদ। আমিরশাহি কর্তৃপক্ষ ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-র সহযোগিতায় তাকে গ্রেপ্তার করে। অবশ্য 'র' কর্তৃপক্ষ আগেই ইন্টারপোলের মাধ্যমে তার বিরুদ্ধে 'রেডকর্নার নোটিশ' জারি করেছিল।

ভারতীয় তদন্তকারী (আই এন এ) অফিসারদের মতে, ফৈজান আহমেদের নাম জানা গিয়েছিল ২০০৮ সালে মুম্বই বিস্ফোরণে যুক্ত অপরাধীদের ধরপাকড়ের সময়। সেই সময় নেপাল হয়ে দুবাই পালিয়ে যাওয়ার সময় ধৃত অনেক জঙ্গিই আহমেদের নাম প্রকাশ করে। গ্রেপ্তার হওয়া আহমেদও স্বীকার করেছে, ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন জঙ্গিদের সে টাকাপয়সা দিয়ে সহযোগিতা করতো।

সে সময় ধৃত জঙ্গিদের জেরা করে আরো জানা যায়, আহমেদ মুজাহিদিন জঙ্গিদের পাকিস্তানে ট্রেনিং-এ পাঠানোর জন্য বাংলাদেশি ও পাকিস্তানি পাশপোর্ট করে দিয়ে তাদের সুবিধা করে দিত। বাটলা হাউস এনকাউন্টারের পর ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের রিয়াজ ও ইকবাল ভাটকল-সহ প্রায় এক ডজন জঙ্গি দুবাইয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। অভিযোগ, আহমেদ সে সময় তাদের অনেককে সবরকমের সুবিধা করে দেয়। আই এন এ-এর হাতে ভারত-নেপাল সীমান্তে ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের যুগ্মপ্রতিষ্ঠাতা ইয়াসিন ভাটকল ও আসাদুল্লা গ্রেপ্তার হওয়ার সময়ই ফৈজান আহমেদের বিরুদ্ধে 'রেডকর্নার নোটিশ' জারি করা হয়েছিল। তাতে তাকে সুলতান আহমেদ ফৈজান নামে উল্লেখ করে তার শারীরিক বিবরণও দেওয়া হয়েছিল।

দেশের বিরুদ্ধে লাগাতার যুদ্ধ চালানো, জঙ্গিদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা, নাশকতামূলক কাজের জন্য ক্যাডার সংগ্রহ ইত্যাদি নানাবিধ অভিযোগ তার বিরুদ্ধে ছিল। ইংরাজি, হিন্দি উর্দু ভাষায় সে সমান দক্ষ। আরও জানা গেছে, গত ১০ বছরের বেশি সময় ধরে সে দুবায়ে প্রতিষ্ঠিত সুদের কারবারী হিসাবে বসবাস করছিল।

গত জানুয়ারি মাসে ইয়াসিনের ভাইপো এবং ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের অর্থ লগ্নীকারী ওয়াহিদ সিদ্দিবাপাকে আমিরশাহি কর্তৃপক্ষ গ্রেপ্তার করলেও বিচারের জন্য ভারতের হাতে তুলে দেওয়ার বিষয়টি এখনো ঝুলে আছে।

লেখকদের প্রতি

যে কোনওরকম লেখা, সে চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন তা কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন রেখে না হলে কোন মতেই ছাপার জন্য বিবেচিত হবে না। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া হয় না। কোনও লেখারই ফটো কপি গ্রাহ্য হবে না। ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুকূল লেখাই প্রকাশ করা হয়।

চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের ওপর ''চিঠিপত্র'' কথাটি অবশ্যই লিখবেন। এতে খুব তাড়াতাড়ি চিঠিটি একেবারে চিঠিপত্র বিভাগে গিয়ে পৌঁছায়।

চিঠিপত্র বা সংবাদ সামগ্রী যাই পাঠানো হোক না কেন তাতে প্রেরকের পুরো নাম-ঠিকানা (পিন কোড সহ) এবং ফোন নম্বর থাকা দরকার। না থাকলে তা ছাপা হবে না

— **সঃ স্বঃ**

৪০টি দেশের ভারতীয়রা মোদীকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে চাইছেন

সংবাদদাতা॥ শুধুমাত্র ভারতেই নয়, বিশ্বের ৪০টি দেশে বসবাসকারী ভারতীয়রা নরেন্দ্র মোদীকে প্রধানমন্ত্রীরূপে দেখতে চাইছেন। এ তথ্য জানিয়েছেন বিজেপি-র 'আন্তর্জাতিক প্রবাসী' বিভাগের সংযোজক বিজয় জৌলী। এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানিয়েছেন, আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, জাপান, ইজরায়েল, ইতালি, চীন, কানাডা, মেক্সিকো, রাশিয়া, গিয়ানা, সুরিনাম, ফিজি, নরওয়ে, ত্রিনিদাদ, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ডেনমার্ক, সুইডেন, ফিনল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, আইসল্যান্ড, চেকগণরাজ্য, আরমেনিয়া, তাই্ওয়ান, পোল্যান্ড, পর্তুগাল, রিপাবলিক অফ কোরিয়া, ভিয়েতনাম, সিঙ্গাপুর, মালেশিয়া, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপিন্স, হংকং, মকাউ, নেপাল, মরিসাস, শ্রীলঙ্কা, ভুটান, তুর্কিস্থান, কেনিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, ওমান, বাহারিন, কাতার, আইল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, নাইজিরিয়া, ঘানা, তানজানিয়া, য়ুগান্ডা ইত্যাদি দেশে বসবাসকারী ভারতীয়রা নরেন্দ্র মোদীকে প্রধানমন্ত্রী রূপে তাঁদের পছন্দের তালিকায় রেখেছেন। টেলিফোন, ইন্টারনেট, ই-মেল, 'চায় পে চর্চা', রান ফর ইউনিটি ইত্যাদি কার্যক্রমেও এই সকল দেশের ভারতীয়রা নরেন্দ্র মোদীর পক্ষে উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করছেন।

নির্বাচন কমিশন পশ্চিমবঙ্গে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট পরিচালনায় সফল হয়নি

কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন যে নখদন্তহীন কাগুজে বাঘ তা এখন সকলেই জেনেছেন। ভোট লুঠ এবং সন্ত্রাস চালানোর পরেও পশ্চিমবঙ্গের শাসক দলের 'দামাল' ছেলেদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে কমিশনের কর্তাদের নির্দেশ দিতে শোনা যায়নি। অথচ নির্বাচন ঘোষিত হওয়ার পর থেকেই রাজ্যের প্রশাসন ও পুলিশ কমিশনের অধীনে চলে যায়। তৃতীয় দফার ভোট চলাকালে তৃণমূলের আশ্রিত গুণ্ডারা বীরভূম এবং বর্ধমানের একাধিক বুথ দখল করে ভোট লুঠ জালিয়াতি অবাধে করেছে। টিভির ক্যামেরায় সবই ধরা পড়েছে। তারপরেও রাজ্যের দায়িত্বে থাকা ছোট বড় মেজ কোনও কর্তারই টনক নড়েনি। উল্টে তাঁরা বলেছেন তৃতীয় দফার ভোট অবাধ ও শান্তিপূর্ণ হয়েছে। এবার তৃণমূলের দামাল দুষ্টুরা যে কায়দায় বুথ দখল করেছে অতীতে ঠিক এইভাবেই সিপিএমের হার্মাদবাহিনী ভোটের দিন দাপিয়ে বেড়াতো। ১৯৭২ সালের বিধানসভার নির্বাচনে কংগ্রেসের ভৈরববাহিনী অবাধে ভোট লুঠ করে প্রয়াত সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়কে মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসিয়েছিল। একটা কথা মানতেই হবে যে নির্বাচন কমিশন পশ্চিমবঙ্গে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট পরিচালনায় গত ৪০-৪৫ বছরে সফল হয়নি। প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার টি এন শেষণ প্রথম ও শেষ ব্যক্তি যিনি দেশে অবাধ ও নিরপেক্ষ ভোটের ব্যবস্থা করতে ভোটদাতাদের সচিত্র পরিচয়পত্র দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। আজকে সিপিএম নেতারা বড় বড় আদর্শ নির্বাচনী বিধির বুলি কপচাচ্ছেন। এই নেতারাই তখন সচিত্র পরিচয়পত্রের বিরুদ্ধে কদর্য ভাষায় শেষণকে আক্রমণ করেছিলেন। সে যুগে ব্যালটে ছাপ দিয়ে ভোট-বাক্সে ফেলতেন ভোটদাতারা। সিপিএমের হার্মাদরা পুলিশ, প্রশাসন এবং বুথের দায়িত্বে থাকা সরকারি কর্মচারীদের প্রত্যক্ষ মদতে ছাপ্পা ভোট দিয়ে দিত। ভোট জালিয়াতিতে বামপন্থীদের একচেটিয়া অধিকার ছিল। আজ সেই মাজাভাঙা ভোট জালিয়াতরাই মায়াকান্না কাঁদছেন। তৃণমূলের বীরভূম জেলার সর্বোচ্চ নেতা অনুব্রত মণ্ডল প্রকাশ্যে বুক বাজিয়ে বলেছেন সিপিএমের পথেই তাঁরা অবাধ শান্তিপূর্ণ ভোটের ব্যবস্থা করেছিলেন। আগামী ২০১৬ সালে পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভার নির্বাচনে তৃণমূলের দামালদের দাপাদাপি বন্ধ

গূঢ়পুরুষের কলম

করতে গেলে কেন্দ্রে বিজেপি সরকার চাই। নরেন্দ্র মোদীকে তৃণমূল এবং সিপিএম যমের মতো ভয় পায়। কারণ তিনি অন্যায় অবিচারের সঙ্গে আপোস করেন না। গত ৩০ এপ্রিল গুজরাটের ২৬টি আসনে একসঙ্গে এক দফায় ভোট হয়েছে। কোনও একটি কেন্দ্র থেকেও ভোট জালিয়াতির অভিযোগ আসেনি বিরোধী কংগ্রেস অথবা কেজরিওয়ালের আপ পার্টির পক্ষ থেকে। গুজরাটের সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের ভোটদাতারা শান্তিতে ভোট দিয়েছেন। কেউ বাধা দেয়নি। দেশের সংবাদমাধ্যম সাধারণভাবে মোদী-বিরোধী। তারাও এবার গুজরাটের ভোটের দিন 'গেরুয়া সন্ত্রাস' দেখতে পায়নি। খারাপ লাগে যখন দেখি দেশের অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের নৈতিক চরিত্র নিম্নগামী। যেনতেন প্রকারে ক্ষমতা দখলে রাখতে মরিয়া। রাজনৈতিক দলের গুণ্ডাদের ভয়ে নির্বাচন কমিশনকে এবার মোট ৯ দফায় ভোটের ব্যবস্থা করতে হয়েছে। মমতাময়ী মমতার পশ্চিমবঙ্গেও ৫ দফায় ভোট করতে হয়েছে। তখন গুজরাটে এক দফায় ২৬টি আসনেই অবাধ শান্তিপূর্ণ নিরপেক্ষভাবে ভোট হয়েছে। যে সংবাদমাধ্যম মোদীর বিবাহ নিয়ে হাজার হাজার শব্দ খরচ করেছে, তারা গুজরাটে এক দফায় শান্তিপূর্ণ ভোট নিয়ে একটা শব্দও খরচ করেনি। কেন? দেশের বড় বড় টিভি চ্যানেলের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী বক্তাদের একজনও গুজরাটের শান্তিপ্রিয় সাধারণ মানুষকে ধন্যবাদ জানাননি। এর থেকে স্পষ্ট যে শুধুই রাজনীতির নৈতিক অবক্ষয় হয়নি, দেশের বিশিষ্টজনদেরও আজ নৈতিক অবক্ষয় হয়েছে।

১২ মে শেষ দফায় নির্বাচনের পরেই টিভি নিউজ চ্যানেলগুলিতে বুথ ফেরত সমীক্ষার ফলাফল দেখা যাবে। সব সময় যে এইসব সমীক্ষা নির্ভুল হয় তা নয়। তবে সাধারণভাবে একটা ধারণা হতে পারে কেন্দ্রে সরকার গড়ার দৌড়ে কারা এগিয়ে আছে। প্রাক্ নির্বাচনী জনমত সমীক্ষায় কেন্দ্রে সরকার গড়ার দৌড়ে সবার আগে ছিল বিজেপি-র নেতৃত্বে এনডিএ জোট। বুথ ফেরত সমীক্ষায় কী বলা হবে সে ব্যাপারে কৌতূহল থাকবে। পশ্চিমবঙ্গের ফলাফলও সমান গুরুত্বপূর্ণ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার বাংলার মানুষের সঙ্গে প্রবঞ্চনা করেছে। বাংলাকে লুম্পেন রাজনীতির আখড়া বানিয়ে দিয়েছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে। সিপিএম এমন অপরাধ করেছিল বলেই বাংলার মানুষ পরিবর্তন চেয়েছিল। বাংলার মানুষ কল্পনাও করতে পারেনি যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সন্ত্রাসের, নৈরাজ্যের অন্ধকার তৈরি করবেন। এমন সেই আঁধার যে আঁধারে নারী ধর্ষণকারীরা, খুনিরা, চিটফান্ডের চিটিংবাজরা প্রকাশ্যে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াবে। আর ধর্ষিতা, প্রতারিতরা গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করবে। কোনও বিচার হবে না। তৃণমূলের তিন বছরের রাজত্বে একজনও নারী ধর্ষণকারীর শাস্তি হয়নি। চিটফান্ডের প্রতারকদের শাস্তি হয়নি। কারণ পুলিশের তদন্ত চলছে। চলবে। অনন্তকাল ধরে চলবে। জানতে ইচ্ছে হয় যে এবারের নির্বাচনে বাংলার মানুষ প্রতারণার জবাব দিয়েছে কিনা। জানতে ইচ্ছে হয় কিসের জোরে মমতা দাবি করছেন যে ৩৭টি আসনে তৃণমূল প্রার্থীরা জিতে গেছেন!

হরিদাসের বুলবুল ভাজা, টাটকা তাজা.....

মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
তৃণমূলনেত্রী
৩০ বি হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিট

দিদিভাই,

মোদী বড্ড বাড়াবাড়ি করছেন। এই রাজ্যে বারবার আসাটা মোটেই ঠিক হচ্ছে না। জোড়া ফুলের মনোপলিতে সিঙ্গল ফুলের এই ভাগ বসানোটা মোটেই সমীচীন নয়। এই গরমে আপনার টানে যেখানে মিটিংয়ে লোক হচ্ছে না, টলিউডের চকচকে প্রার্থী, টগবগে নায়ক নায়িকাদের নিয়ে গিয়েও যখন মিটিং জমানো যাচ্ছে না তখন আপনার ভাষায় ওই 'কাগুজে বাঘ', 'শয়তান', 'কমরেড', 'দাঙ্গার মুখ', 'হরিদাস' ইত্যাদি ইত্যাদিকে দেখতে এত লোক আসবে কেন? কেন তাঁর কথা শুনতে উপচে পড়বে মানুষ? কেন কেন কেন? কেন তাঁকে নিয়ে এত উৎসাহ দেখাবে ১৮ থেকে ২৮? কেন মোদী মোদী রবে বাংলার বাতাসে লহর তুলবে আট থেকে আশি?

আপনার মনেও তো ঠিক এই প্রশ্নগুলোই এসেছে। বাংলার সব মানুষের মনেও একই প্রশ্ন। এ কোন বাঁশিওয়ালা? যে ডাকলেই সবাই ছুটছে। এমনকী সবাই বলছে ভবিষ্যতে নাকি আপনিও ছুটতে পারেন। অতীতেও যেমন ছুটেছেন।

তবে দিদি, লোকটার এলেম আছে বটে। তিনি প্রশ্ন করলেন আপনার ছবি ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকায় কে কিনেছে? কারও নাম বললেন না। আর আপনি এবং আপনার ভাইয়েরা বলতে শুরু করলেন সুদীপ্ত সেন ছবি কেনেননি। এমনকী সারদা কর্তাকে জেল থেকে বের করে সাক্ষী দেওয়ালেন। আপনারা মানহানির মামলার হুমকি দিয়েছেন। কিন্তু দিদি, তিনি তো কারও নাম বলেননি। খালি বলেছেন, এমন একটা অভিযোগ শোনা যাচ্ছে, তাই বিজেপি ক্ষমতায় এলে অমন শিল্প-প্রেমী ক্রেতাকে খুঁজে বার করবেন। তাতেই আপনি যারপর নাই রেগে 'ঠাকুর ঘরে কে রে? আমি তো কলা খাইনি' মার্কা সমস্ত স্বীকার করে নিলেন।

আপনার রাগটাই আসলে খারাপ। শ্রীরামপুরে মোদী প্রথমবার বললেন, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের রাজ্য থেকে তাড়ানো হবে। আপনার তো এতে সমর্থন জানানোর কথা। আপনারই রাজ্যের ওপর থেকে অন্যায্য চাপ কমবে তাতে। কিন্তু আপনি রাগ করে স্বীকার করে নিলেন কোচবিহার ও রাজ্যের অন্যত্র অনেক বাংলাদেশি আছেন এবং তাঁরা থাকবেন। আপনি কোনওভাবেই তাঁদের বাংলাদেশে ফিরে যেতে দেবেন না। এ তো দিদি, দেশদ্রোহিতা!

যাকগে দিদি, আমি আপনার এই অস্থির সময়ে এত চিন্তায় ফেলার মতো কথা বলব না। আর যেগুলো বললাম, সেগুলো কিন্তু মোটেই আপনার সমালোচনা করার জন্য নয়। আমি বললাম শুধু আপনাকে সতর্ক করার জন্য। মোদী কিছু বললেই অমনি রেগে গিয়ে উল্টোপাল্টা যত বলছেন তত 'আব কি বার মোদী সরকার' নিশ্চিত হয়ে যাচ্ছে।

তবে আর কিছু করার নেই। যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। ১৬ মে সকাল থেকে আপনার জন্য যে অনেক দুঃসংবাদ অপেক্ষা করে আছে সেটা খেয়াল রাখবেন। বাংলার হাওয়া কেমন জানেন? সেদিন আপনার একটা মিটিং শুনে ফিরছি হঠাৎ হ য ব র ল-র বেড়ালটার সঙ্গে দেখা। চেনা চেনা লাগছে দেখে জিজ্ঞেস করলাম কী ভায়া কী খবর?

বেড়াল বলল, হাওয়া খাচ্ছি হাওয়া। আমি কিছু বুঝলাম না। তবু বোঝার ভান করে বললাম, হাওয়া কেমন। বেড়াল বলল, গর্মেন্টের মতো। আমি বললাম সেটা কেমন? বেড়াল বলল এতই যদি কৌতূহল তবে সংসদে গেলেই পার।

আমি থতমত খেয়ে বললাম, রাস্তাটা বলতে পার? সে বলল, আমি পারি না। আমার দিদি থাকলে বলে দিত। জানতে চাইলাম দিদি কোথায় থাকে? বেড়ালটা ফ্যাচ ফ্যাচ করে হেসে বলল, সে বলা ভারি শক্ত। আমি বললাম কেন?

সে বলল, ইলেকশনের বাজারে সে বলা শক্ত। তারপর কী মনে করে মাটিতে আঁক কেটে বলল, এই মনে কর দিল্লী, এই নমো দাদা পদ্ম ফোটাচ্ছেন, এই রাগা ভাই হাত নাচাচ্ছেন, এই মনে কর আন্না দাদু পালিয়ে গেলেন...

রেগে বিরক্ত হয়ে বললাম, তো দিদি কোথায়?

বেড়ালটা একগাল হেসে বলল, ওই তো বিপদ। দিদিকে কি আর এমনি সেমনি লোক পেয়েছ? যখন ভাববে দিদি বিজেপিতে, তখন আসলে দিদি কংগ্রেসে। আবার যখন দেখবে দিদি কংগ্রেসে আছেন তখন দিদি আসলে বিজেপিতে। আর যখন দেখবে দুটোর কোথাও তিনি নেই, তখন আসলে দুটোতেই আছেন। বলেই লেজ দুলিয়ে, এক লাফে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল...

— **সুন্দর মৌলিক**

ভারত শুধু বাঙালি হিন্দুর নয়, নির্যাতিত সব হিন্দুরই আশ্রয়স্থল

নবারুণ দে

স্বস্তিকায় বহু বিশিষ্ট লেখক বাংলা, বাঙালির (উভয়বঙ্গের) ইস্যুকে নিয়ে লাগাতার নীরব আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। আমরা যারা পূর্ববঙ্গকে ভুলে না যাবার শপথ নিয়েছি তাদের কাছে এ এক পরম ভরসার স্থল। বাংলা ও বাঙালিকে নিয়ে ভাবনাপ্রসূতই আমার এই চিঠি সম্মানিত পাঠককুলের সামনে রাখছি বাংলা নববর্ষের ভাবনার সঙ্গে জুড়ে নেবার জন্য।

প্রায় সাঁইত্রিশ কোটি বাঙালির বাস বিশ্বজুড়ে। বাঙালি পৃথিবীর পঞ্চম সংখ্যাগরিষ্ঠ ভাষাভাষী গোষ্ঠী। শুধুমাত্র ভারতেই মোট জনসংখ্যার ৮.১১ শতাংশ মানুষ অর্থাৎ প্রায় এগারো কোটি বাঙালির বাস। হিন্দিভাষীর পরই এদেশে দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ ভাষাভাষী গোষ্ঠী। হাজার বছর পুরনো বাংলা ভাষাকে ইউনেসকো পর্যন্ত সবচাইতে শ্রুতিমধুর ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

তবু বাঙালিরা আজ পশ্চাদপসরণের দিশায়। এই অবনমন শুরু হয়েছে সম্ভবত ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের আমল থেকেই। বঙ্গভঙ্গ রদ ও অব্যবহিত পরই ১৯১১ সালে কলকাতা থেকে রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরণ যেন বাঙালি মননে কোপ বসায়। এর পর ধর্ম ফের বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করার ভূমিকা নেয়। ১৯৪৭ সালে যারা ভারতীয় ছিল হঠাৎ পাকিস্তানি হয়ে যায়। ১৯৭১ সালে যারা পাকিস্তানি ছিল তারা বাংলাদেশি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে বাধ্য হয়, কারণ পাকিস্তান তার পূর্ব প্রান্তে বাঙালি কৃষ্টি ও সভ্যতা মুছে ফেলতে উদ্যত হয়।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের একক প্রচেষ্টায় পশ্চিমবঙ্গ হিন্দু বাঙালির ভূখণ্ড পাকিস্তানের থাবা থেকে রক্ষা পায়, কিন্তু মার্ক্সবাদীদের দখলে চলে যাওয়ায় ক্রমশ পিছিয়ে পড়তে থাকে। স্বাধীন ভারতে ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে শতহস্ত দূরে থাকতে হয়েছে বাঙালিকে। দেশের জনসংখ্যার আট শতাংশ জনগোষ্ঠী বাঙালির জন্য বরাদ্দ হয়েছে ত্রিপুরা পশ্চিমবঙ্গ মিলিয়ে দেশের মোট ৩ শতাংশ ভূখণ্ড। বাংলাদেশে ধর্মীয় নির্যাতন হিন্দু বাঙালিকে নিরন্তর এদেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছে, এদের ভারতের সর্বত্র অসংগঠিত গোষ্ঠী হিসাবে নিজেদের ভাগ্যের কাছে সমর্পণ করে দিতে বাধ্য করেছে। তাঁরা এককালের ইহুদিদের মতো জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়েছেন। সর্বত্র এরা অত্যাচারের শিকার। এরা কি ভুল করেছিলেন? এর জবাব কে দেবে? জহরলাল নেহরু, মহাত্মা গান্ধী, জ্যোতি বসু দেননি। ভবিষ্যতে কেউ দেবে?

> **দেগঙ্গা, ক্যানিং, হাওড়া, নলিয়াখালি, কামদুনি যখন হচ্ছে, বাংলাদেশে হিন্দুরা ক্রমাগত আক্রান্ত হচ্ছেন, মমতা নরেন্দ্র মোদীকে দাঙ্গাবাজ বলে গাল পাড়ছেন। গোটা দেশের মাঝে পশ্চিমবঙ্গ যখন ধর্ষণে দ্বিতীয় স্থানে, মমতা আরও বেশি মুসলমান তোষণে মত্ত।**

এদেশে বাঙালি বঞ্চনার সাতকাহন শেষ হওয়ার নয়। বাঙালি সামরিক বাহিনীর তিনটি শাখাতেই প্রধানরূপে অবসর নিয়েছেন। বাঙালির লড়াকু মানসিকতাই একসময় ইংরেজকে ব্যাকফুটে ফেলে, তবু কি বাঙালি যোদ্ধার জাত নয়? স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে— শিখ, জাঠ, গোর্খাদের মতো বেঙ্গল রেজিমেন্ট নেই কেন?

পশ্চিমবঙ্গবাসীর উভয় হাতে লাড্ডু তুলে দেবার যে প্রতিশ্রুতি নরেন্দ্র মোদীর ভাষণে ব্রিগেডে সম্প্রতি মানুষ শুনলেন সেই অভিজ্ঞতা রাজ্যবাসীর অজানা। সত্তরের দশকে বামপন্থীরা ক্ষমতা দখল করার পর তার সম্ভাবনা আরও কমে যায়। বামপন্থীরা হামেশাই সীমিত ক্ষমতার অজুহাতে রাজ্যবাসীর ভোটে নির্বাচিত হওয়া সত্ত্বেও এই রাজ্যকে কেন্দ্র থেকে শতহস্তে দূরে রেখেছেন। লাড্ডু তো দূর, বাঙালির সঙ্গে দিল্লীর দূরত্ব বেড়েছে বৈ কমেনি। সেই দূরত্ব শুধু কার্জনের দ্বারা দেশের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে সরিয়ে নিয়ে যাবার ফলেই গড়ে ওঠেনি। বামপন্থীরা কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার কথা বলে মানুষের সহানুভূতির ভোট কুড়িয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ রসাতলে গেছে। আজ মমতার মতো নেত্রীর হাত ধরে পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ কি? ডেরিক ও ব্রায়ান এই সরকারের মুখপাত্র। আমির খান নয়, শাহরুখ খান এই রাজ্যের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর। আমাদের কতটা আশাবাদী হওয়া উচিত? দেগঙ্গা, ক্যানিং, হাওড়া, নলিয়াখালি, কামদুনি যখন হচ্ছে, বাংলাদেশে হিন্দুরা ক্রমাগত আক্রান্ত হচ্ছেন, মমতা নরেন্দ্র মোদীকে দাঙ্গাবাজ বলে গাল পাড়ছেন। গোটা দেশের মাঝে পশ্চিমবঙ্গ যখন ধর্ষণে দ্বিতীয় স্থানে, মমতা আরও বেশি মুসলমান তোষণে মত্ত। অবস্থা এমন যে, বাংলাদেশে হিন্দু নিগ্রহকারী

দুর্বৃত্তরা সে দেশে তাড়া খেয়ে পশ্চিমবঙ্গে তার সরকারেরই এক সাংসদ আহমেদ হাসান ইমরানের সুরক্ষাধীন বলে অভিযোগ। মমতা ভাবলেশহীন। পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত সলমান বসির মমতার রাজনীতিতে প্রীত হয়েই তাঁকে পাকিস্তান যাবার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। রতনে রতন চেনে!

হিন্দুত্বের সার স্তোত্র 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' বাঙালিরা যুগযুগ ধরে মেনে আসছে, তাই খোদ কলকাতা শহরে বাঙালির সংখ্যা মাত্র ত্রিশ শতাংশের কাছাকাছি ঠেকলেও এতে তাঁরা মোটেই শঙ্কিত নন। ইংরাজি, হিন্দি, উর্দু ভাষার দাপটে বাংলা যখন প্রায় মূর্চ্ছা যাচ্ছে বাঙালির তাতেও চেতনা নেই। পশ্চিমবাংলার সীমানা পেরোলেই কোন রাজ্যে প্রবেশ করলাম সহজেই চেনা যায়, অন্য রাজ্য থেকে পশ্চিমবাংলায় প্রবেশে ঠাহর করতে সময় লেগে যায়। বাংলায় সাইনবোর্ড লিখতে হবে এই বাধ্যবাধকতা বাংলার সরকার কবেই গুলে খেয়েছে। হিন্দি, উর্দুর প্রাবল্য পশ্চিমবঙ্গের আগাপাশতলাকে মিনি বিহার আর মিনি পাকিস্তানে পরিণত করে ছেড়েছে। তবু বাঙালির হেলদোল নেই। নেই সরকারের ভ্রূক্ষেপ।

সদ্য রবীন্দ্র ও বিবেকানন্দ জন্ম সার্ধশতবর্ষ আমরা পেরিয়ে এলাম। নিজেকে বাঙালির উত্তরাধিকারী হিসাবে বাঙালির জন্য জাতির জন্য আমাদের সবারই কিছু করণীয় আছে। নয় কি? না হলে কিসের রবীন্দ্রনাথ আর বিবেকানন্দকে নিয়ে গর্ব করার অধিকার আমাদের?

বাঙালি সমস্যা মূলত ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক। সব সমস্যার জন্য বাঙালিরা দায়ী নন, কিন্তু স্বাধীনতা উত্তরকালে উদ্ভূত সমস্যার জন্য অবশ্যই তদানীন্তন রাজনৈতিক পরিকাঠামো ও আমজনতাই দায়ী।

নেতাজীকে নিয়ে দিল্লীর ষড়যন্ত্র বাঙালির কোমর ভেঙেছে। নেতাজী থাকলে কি বাংলা এত অবহেলিত হোত? শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বিতর্কিত মৃত্যু না হলে কি ইন্দিরা প্রধানমন্ত্রী হতে পারতেন? তিনি বেঁচে থাকলে নেহরু-লিয়াকত চুক্তি আর ইন্দিরা-মুজিব চুক্তির মতো দেশ-স্বার্থবিরোধী চুক্তির প্রভাব পড়ত এ দেশে? বাংলাদেশের হিন্দুরা কি এতটা অসহায় হোত। অনুমান সিদ্ধ হলেও বলব না। নেতাজীর অন্তর্ধান রহস্য ভেদ করতে দিল্লী সহযোগিতা করেনি মানলাম। বাংলার রাজনৈতিক নেতৃত্বের ভূমিকাই বা আলোচনার ঊর্ধ্বে থাকবে কেন? স্বাধীনতার সময় থেকেই বিড়লা- গোয়েঙ্কারা যে মৌরসি পাট্টা পশ্চিমবাংলায় গড়ে তুলেছিলেন তাও সম্ভবত এড়ানো যেত। এড়ানো যেত লায়ালকার মাঠ-সহ কলকাতায় আরও বহু মাড়োয়ারি মালিকানাধীন জমি থেকে উদ্বাস্তু উৎখাতের প্রক্রিয়া ও মরিচঝাঁপির অমানবিক অত্যাচার। জ্যোতি বসু থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তোষণের ধারা আজও অব্যাহত। বাঙালিরা কোণঠাসা। পশ্চিমবঙ্গে, দিল্লীতে সর্বত্র। বাঙালি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের প্রতি কতটা অন্যায় হয়েছে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী ব্রিগেডে ভরা সভায়। এর আগে অবাঙালি দূর, বাঙালি কোনও নেতাকেও তো এই অবিচারকে নিয়ে রা কাড়তে শুনিনি কখনও? নিজে প্রধানমন্ত্রী হতে না পেরে জ্যোতি বসু শুধু আক্ষেপ করেছেন। পলিটব্যুরোতে বাংলা-বিরোধী লবি ছিল না? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণববাবুর রাষ্ট্রপতি হওয়ার রাস্তায় স্পিড ব্রেকার বসিয়ে, প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে যাত্রাপালা করেননি? বাঙালি নিজেকে নিজে শেষ করার শপথ নিয়েছে তাই অপরকে দোষ দিয়ে লাভ কি? কাঁড়ি কাঁড়ি বাঙালি সাংসদ একজোট হলেই যেখানে পশ্চিমবঙ্গ-সহ বাঙালির যাবতীয় ইস্যু সংসদে আলোচ্য বিষয় হিসেবে সহজেই উঠে আসতে পারে, সেখানে বাঙালি সাংসদরা চেতনা ফিরে পাবেন কবে?

চেষ্টা চালিয়ে গেলে যে সাফল্য লাভ করা সম্ভব তার একটা ছোট্ট উদাহরণ দেব। অনেকেই একটা খবর সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন যে, বিজেপি-র নির্বাচনী ইস্তাহারে চল্লিশ নম্বর পাতায় শেষ লাইনে লেখা আছে "India shall remain a natural home for persecuted Hindus and they shall be welcome to seek refuge here" অর্থাৎ ভারতবর্ষ উৎপীড়িত হিন্দুদের সাধারণ আবাস হিসাবেই বিবেচিত হবে। এদেশে তারা স্বাগত।

এই প্রতিশ্রুতি নরেন্দ্র মোদী ২২ ফেব্রুয়ারি শিলচরে এক বিশাল জনসভায় প্রথম দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর কথা রেখেছেন ইস্তাহারে প্রতিশ্রুতি অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে। এজন্য আমরা কৃতজ্ঞ। অসম বিজেপি বিশেষত বরাক উপত্যকার বুদ্ধিজীবীদের পীড়াপীড়িতেই তা সম্ভব হয়েছে। এখানকার সাংসদ কবীন্দ্র পুরকায়স্থ বিস্থাপিত হিন্দু বাঙালিদের নাগরিকত্ব ও দাবি দাওয়া সম্পর্কিত একটি বিল সংসদে আগেই পেশ করেছেন। এবার এনডিএ সরকার গঠিত হলে ভারতে সর্বত্র পাকিস্তান-বাংলাদেশ থেকে আগত নিপীড়িত জনগণের নাগরিকত্ব ইস্যু প্রাধান্য পাবে। পশ্চিমবাংলার উদ্বাস্তুরাও এতে উপকৃত হবেন।

১৯৮০ সালে অসমে বিদেশি বিতাড়ন আন্দোলন যখন তুঙ্গে তখন শিলচরের এক প্রতিনিধিদল দিল্লী যান। তখন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জ্ঞানী জৈল সিং। বিরোধী দলের এক শীর্ষ নেতার সঙ্গে দেখা করে ওই আন্দোলনে বাঙালি হিন্দুরাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে উল্লেখ করলে তিনি বলেছিলেন "উই হ্যাভ নো সিমপ্যাথি ফর বেঙ্গলি হিন্দুজ, দে আর অল কম্যুনিস্ট"। তিন দশকে আমরা দলটির দৃষ্টিকোণ পাল্টে দিতে পেরেছি, তাই-বা কম কিসে? অবশ্য ওই নেতা আবারও এভাবেই আক্রমণ শানাতে পারেন, কারণ অর্মত্য সেন কিছুদিন আগেই এক টিভি চ্যানেলে বিবৃতি দিয়েছেন "বাঙালিরা বিজেপিকে এমনিতেই ভোট দেয় না"। তাঁর ধারণা সব বাঙালিই বুঝি কমিউনিস্ট। এটা ঠিক নয়। বাঙালিদের কম্যুনিজম নিয়ে মোহভঙ্গ হয়েছে। তারা দেশের, জাতীয় দলের সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে চায়। মূল ধারার রাজনীতিতে শরিক হতে চায়। জীর্ণ পুরাতন বর্ষ পেরিয়ে বাংলা ও বাঙালি ফের আরেক নববর্ষের ছোঁয়া পেল। বাঙালির নববর্ষের সঙ্গে নির্বাচন বাংলায় নব পরিবর্তন এনে মুছে দিক যাবতীয় হতাশা। ভাতঘুম ভেঙে অন্তত বাঙালি জাগুক, এই কামনা।

বিশেষ রচনা

ইউপিএ সরকার হারতে চলেছে

নবকুমার ভট্টাচার্য

মনমোহন সিং পরিচালিত ইউপিএ সরকারের আয়ু আর অবশিষ্ট নেই অর্থাৎ এই সরকার হারতে চলেছে। গত এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে আন্ধেরিতে মুম্বাই বিমানবন্দরে ফ্রাঙ্কফুট যাওয়ার ফ্লাইটের অপেক্ষায় বসেছিলাম। সেই অবসরে বেশ কিছু মানুষের আলোচনার নির্যাস ছিল ইউপিএ সরকার আর ফিরছে না। জার্মানিতে প্রবাসী ভারতীয়রাও বলছেন মনমোহন সিং, সোনিয়া গান্ধীরা এবার রাহুল গান্ধীকে কিছুতেই ক্ষমতায় আনতে পারবেন না। ২০০৯-তে মনমোহন সিং প্রধানমন্ত্রী হয়ে যে আশার বাণী ও স্বপ্ন ভারতবাসীকে দেখিয়েছিলেন ২০১৪-তে তিনি সেই আশার বাণীগুলিকে রসিকতায় পরিণত করে, ভারতবাসীর সমস্ত স্বপ্নকে প্রতারিত করে পালিয়ে গেলেন। ইউপিএ সরকার ভোটে লড়ছে অথচ সেই সরকারের বিগত দশ বছরের প্রধানমন্ত্রী জনগণের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন নিন্দা ও ধিক্কারের ভয়ে। জনগণের কাছে গিয়ে তাঁর বলবার মুখ নেই যে দশ বছরে এই কাজগুলি আমি করতে পেরেছি। এই সরকারের অর্থমন্ত্রী ভয়ে আর ভোটেই দাঁড়াননি। তিনি নাকি দেশকে অর্থনীতিতে সমৃদ্ধ করতে পেরেছেন বলে দাবি করে থাকেন। অথচ একটা জনসভাতেও তাঁর দেখা নেই। পাঁচ বছরের সরকারের কোনও উন্নয়ন নেই যা দেখিয়ে ভোটের প্রচার করা যাবে। তাই প্রচারের অভিমুখ মোদী বিরোধিতা। কংগ্রেসের নেতা থেকে কাঁথা, চ্যালা থেকে প্যালা সকলেরই এক সুর। মোদী উন্নয়ন দেশ গড়ার স্বপ্ন দেখালেও অন্যদের ইস্তাহারে সে সবের বালাই নেই। থাকার কথাও নয়। গত পাঁচ বছরে ইউপিএ সরকারের ছোট বড় মিলিয়ে ৪৩ টি কেলেঙ্কারি প্রকাশিত হয়েছে, পর্দার পিছনে আরও কত কেলেঙ্কারি রয়ে গেছে তার হিসেব নেই। তাঁরা ক্ষমতায় এলে আগামী পাঁচ বছরে আরো কি কি কেলেঙ্কারিতে কত কোটি টাকা আত্মসাৎ করবেন তার আগাম হিসেব কষা সম্ভব নয়। ইউপিএ জোট সরকারের অন্য শরিকদেরও ধোয়া তুলসীপাতা বলা যাবে না। সকল দলের একেকজন রত্ন রয়েছে। তাই এবারের নির্বাচন দুর্নীতি বনাম উন্নয়ন। ইউপিএ নিজেদের দুর্নীতিকে চাপা দিতে সাম্প্রদায়িক সাম্প্রদায়িক বলে চিৎকার করছে। জনগণ

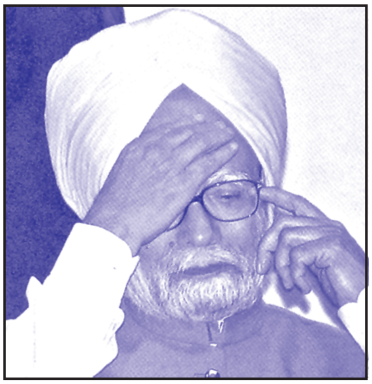

সাম্প্রদায়িক মোদীকে একবার আটকে দিলেই আগামী পাঁচ বছরে দুর্নীতিতে যুক্ত থাকার অধিকার পাওয়া যাবে, কারণ তখন বড় মুখ করে বলা যেতেই পারে জনগণ জেনে বুঝেই আমাদের সে অধিকার দিয়েছে। সংসদে লোকপালের মতো অপর একটি বিল আনা যেতে পারে যেখানে বলা হবে সমস্ত রকমের কেলেঙ্কারির সাংবিধানিক স্বীকৃতি চাই। লোকপাল বিল আর কেলেঙ্কারির বিল না হয় পাশাপাশিই থাকবে। গণতান্ত্রিক দেশে সকলেরই সমান মর্যাদা। পদ্মশ্রী, ভারতরত্নের পাশে 'চৌরচূড়ামণি' জাতীয় কিছু পুরস্কার থাকলে কী এমন ক্ষতি হবে দেশের!

এনডিএ সরকার যে সমৃদ্ধ অর্থনীতি রেখে গিয়েছিল দশ বছরে সেই অর্থনীতির দফারফা করেছে ইউপিএ ১ এবং ২। একজন সেরা অর্থনীতিবিদকে ক্ষমতায় বসিয়ে দেশের অর্থনীতির এই সর্বনাশ হলো কেন? তাহলে কি এবার বলতেই হয় বেড়ালকে ক্ষমতায় বসানোর জন্যই বাঘ বানানো হয়েছিল। মনমোহন সিং আসলে অর্থনৈতিক ব্রোকার। বিশেষজ্ঞ নন, তিনি সৎও নন। অর্থনীতির পরীক্ষায় তিনি ফেল, সততার পরীক্ষায়ও তিনি ফেল। এমন ব্যক্তি যে সরকারের নেতা হন এমন নিষ্কর্মা সরকারকে ক্ষমতায় আনতে পাগলেও দুবার ভাববে। ১৯৯৯ সালে লোকসভায় ১১৪টা আসন পেয়েছিল কংগ্রেস, এবার তার থেকেও কম পাওয়া উচিত। কংগ্রেস নিজেরাই স্বীকার করছে এবার তারা একশ আসন পেলে খুব বেশি পাবে। ২০০৯-তে তাদের লোকসভার আসন ছিল ২০৬। কংগ্রেস নিজেরাও এবার জেতার জন্য লড়ছে না। এখন তাদের মূল লক্ষ্য নরেন্দ্র মোদীকে আটকানো। ভারতবর্ষে বর্তমানে দুর্নীতির বিশ্বরেকর্ড হলেও ভারতবর্ষের জনগণ কখনও চোরেদের সমর্থন করেনি। সম্ভবত এবারেও করবে না।

সাম্প্রদায়িক ধুয়ো তুলে কি দুর্নীতির জাতীয়করণ সম্ভব? সাম্প্রদায়িক শব্দটিকে আজ রসিকতার পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছেন অনেকেই। এখন তো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে ভারতবর্ষের দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী ব্যক্তিদের সাম্প্রদায়িক আখ্যা দেওয়া হচ্ছে এবং দেশবিরোধী জাতীয়তাবাদ-বিরোধী শক্তিকে ধর্মনিরপেক্ষ বলা হচ্ছে। এর পরিণতি কি? এদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ সংখ্যালঘু তুষ্টিকরণ। রামের হক রহিমকে পাইয়ে দেওয়ার নাম ধর্মনিরপেক্ষতা। রাজনীতিকরা যখন নিজের হক কোনোক্রমেই হারাতে রাজি নন তখন দেশের সংখ্যাগুরু জনগণ তাদের নিজেদের হক ধর্মনিরপেক্ষতার নামে অন্যকে ছাড়বে কেন? একদিন দেশ ভাগের জন্য কোটি কোটি মানুষ তাদের নিজের হক ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়েছিল প্রাণের ভয়ে, সম্ভ্রম

হারানোর ভয়ে। আজও বাংলাদেশ থেকে হিন্দুরা তাদের হক ছেড়ে আসতে বাধ্য হচ্ছে। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের বুলি এসব বিষয়ে বন্ধ কেন? কাশী থেকে কন্যাকুমারীর মানুষ আজ বলছেন মোদী শুধু একজন ব্যক্তি নন তিনি ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ভণ্ডামি বন্ধের একজন প্রতীকও। তাই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাবাজ বলে মোদীকে যত গালাগাল পাড়া হচ্ছে তাঁর জনপ্রিয়তা ততই ঊর্ধ্বমুখী হচ্ছে। খোদ পশ্চিমবঙ্গেও এই মুহূর্তে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের থেকেও মোদীর জনপ্রিয়তা বেশি। ধর্মনিরপেক্ষতার এই ভণ্ডামির বিরুদ্ধে মানুষ আজ সোচ্চার হতে আরম্ভ করেছেন। প্রগতিশীল ব্যক্তিও আজ গুজরাট দাঙ্গাকে নিন্দা করার পাশাপাশি মোদীকে সমর্থন করছেন। কয়েক সপ্তাহে মুম্বাই এবং গুজরাটের বহু মুসলমান যুবককে প্রশ্ন করে দেখেছি তারাও চায় ইউপিএ সরকার চলে যাক। মুম্বাই থেকে কলকাতায় ফেরার সময় বিমানে আলাপ হয়েছিল কসবার ইসাক হোসেন এবং উলুবেড়িয়ার সাইফুদ্দিন মোল্লার সঙ্গে। দুজনেই সোনার গহনার কারিগর। ইসাক গলার জোর বাড়িয়েই বলে গেল, মোদী আপনাদের চোখে দানব হলেও আমাদের চোখে ভগবান। অন্যরা কেবল আমাদের ভোট চায় কিন্তু মোদী চায় আমাদের উন্নয়ন। সইফুদ্দিন প্রশ্ন করেছিল, মোদী দাঙ্গাবাজ হলে মুম্বাই ও গুজরাটের যত সোনা হীরে রূপোর কাজে, জরির কাজে মুসলমান ছেলেরা পশ্চিমবঙ্গ থেকে যায় কেন? মমতা দিদি কি জানেন এই তথ্য! আসলে 'রেখেছ সংখ্যালঘু করে মানুষ করোনি'— মানুষ হবার জন্যই, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মানুষ করার জন্য পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান যুবকদের তাই আজ দলে দলে দাঙ্গাবাজ মোদীর রাজ্যে যাত্রা।

ইউপিএ সরকারের হারার অন্যতম কারণ রাহুল গান্ধীর ব্যর্থতা। ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর পর গান্ধী পরিবারের সার্থক নেতা কে? ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর পর ১৯৮৪ সালে কংগ্রেস লোকসভায় ৪১৫টি আসন পেয়েছিল। এ কৃতিত্ব রাজীব গান্ধীর নয়। মানুষ ইন্দিরাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে ভোট দিয়েছিল। ১৯৮৯-তে কংগ্রেস পেয়েছিল ১৯৭টি লোকসভা আসন। ১৯৯১-তে ২৪৪ আসন। তারপর ১৯৯৬ থেকে ২০০৪ পর্যন্ত কংগ্রেসের আসন কোনোবারেই দেড়শও পার হয়নি। দেশের মানুষ আর কংগ্রেসকে চায় না। এবারে সেই প্রত্যাখ্যান বড় ব্যবধানের হতে পারে। রাহুল গান্ধীর ক্ষমতা কি সেই বাধা অতিক্রম করার যোগ্য? বাবা রামদেবের কথায় অশালীনতার গন্ধ থাকতে পারে কিন্তু রাহুল গান্ধী সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য তো মিথ্যা নয়। রাহুল গান্ধীর বিশ্বাসযোগ্যতা কি? যিনি নিজে কোনো স্বপ্ন দেখেন না, দেশের ১২৫ কোটি মানুষকে কি স্বপ্ন দেখাবেন। বস্তুত কংগ্রেসের কোনো নেতারই বিশ্বাসযোগ্যতা নেই। দিগ্বিজয় নারায়ণ সিং অপরের সংসার ভাঙিয়ে তাঁর বৌ-কে বিয়ে করতে চলেছেন। অবশ্য বলা হচ্ছে দুপক্ষের পারস্পরিক সম্মতিতে বিবাহবিচ্ছেদ হবার পরেই দিগ্বিজয় বিয়ে করবেন। ইরাকের সাদ্দাম হোসেনও এইরকম ভাবে বহু সুন্দরী মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন দুপক্ষের পারস্পরিক সম্মতিতে বিবাহবিচ্ছেদ হবার পরেই। বৌ-এর প্রতি রাজার দৃষ্টি পড়লে কোন স্বামী আর প্রতিবাদ করবেন! শের আফগানের পরিণতি তো সকলেরই জানা আছে। এর নাম ভারতীয় সংস্কৃতি? এর পরেও মোদীকে গাল পাড়বেন কোন লজ্জায়!

আধ্যাত্মিক তথা জ্যোতিষ বিচারেও ইউপিএ সরকার হারতে চলেছে। এবছর ভারতের চান্দ্রবর্ষ আরম্ভ হয়েছে ৩১ মার্চ রাত ১২টা ১৫ মিনিটে। ভারতে চান্দ্রবর্ষ শুরুর বিশেষ মুহূর্তে বৃহস্পতি থাকছে মিথুনে, ডিগ্রি ১৮০.৪৬, নক্ষত্র আদ্রা। শনি থাকছে বৃশ্চিকে মাত্র ০৩ মিনিট অবস্থানে। একে বলে সন্ধিস্থান। মঙ্গলগ্রহের স্থিতি থাকছে ২৯০.৪০ কন্যা রাশিতে। এটাও সন্ধিগত। লগ্নের ডিগ্রি ধনুতে থাকছে ৫৫ মিনিটে। অর্থাৎ ১ ডিগ্রিও নয়। এবং এটাও সন্ধিগত। রাহু থাকছে তুলায়, মেষে কেতু। রবি ও চন্দ্র মীনে এবং বুধ ও শুক্র কুম্ভ রাশিতে। প্রধান গ্রহগুলো সেই সঙ্গে সঙ্গে লগ্নও একেবারে সন্ধিগত। বিশেষ করে শনির সন্ধিগত অবস্থান পরিবর্তনের পক্ষে যথেষ্ট। সুতরাং এই ইউপিএ সরকারকে জ্যোতিষ বিশেষজ্ঞদের বিচারে চলে যেতে হচ্ছেই।

দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ তাঁদের নির্বাচনী পদক্ষেপ স্থির করে নেন সমসাময়িক পরিস্থিতি অনুসারে। ২০০৯ সালে সারা বিশ্ব জুড়ে টাকা উড়ছিল হাওয়ায়। জনগণ ভেবেছিল সেই টাকার ফোয়ারার মূলে রয়েছে মনমোহন সিংহের কেরামতি। এ যে উন্নত বিশ্বের নোট ছাপিয়ে মন্দা টপকানোর কৌশল সেটি উপলব্ধি হয়নি। ফল হলো অবধারিত। দেশের অর্থনীতি হলো ধূলিসাৎ। এবারের নির্বাচনী ইস্যু কিন্তু অন্য প্রকারের আর তা হলো দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়া প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলা এবং দুর্নীতি। সরকার এখন পুকুর চুরির প্রতীক। সরকারের প্রতিটি পদক্ষেপেই রয়েছে ঘুষ আর বখরা-বাঁটোয়ারার কাহিনী। উত্তরপ্রদেশে সমাজবাদী পার্টির নেতৃত্বে বিক্ষিপ্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। কিন্তু ওই দলের সমর্থন নিয়েই ইউপিএ-২। তাই কড়া হাতে দাঙ্গা দমন করার কোনো প্রয়াস হয়নি দিল্লীর তরফ থেকে। মোদীকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাবাজ বলে নিত্য গাল পাড়লেও এই দল সম্পর্কে ইউপিএ দলের নেতারা নিশ্চুপ। মুদ্রাস্ফীতি আয়ত্তের বাইরে চলে গেলেও সরকারের পক্ষ থেকে বিশেষ কোনো হেলদোলও হয়নি। তাই যাঁরা শুধু ধর্মনিরপেক্ষতার সমর্থক হওয়ার জন্য বিজেপিকে হারাতে সচেষ্ট হতেন, তাঁরা বোধহয় এবার সেই বস্তাপচা পবিত্র দায়িত্বটি পালন করতে আগের মতে তৎপরতা দেখাননি। বরং যাঁরা চান সরকার হোক যুগপৎ সত্যিকারের ধর্মনিরপেক্ষ ও দায়িত্বশীল— তাঁরাই এবার আগ বাড়িয়ে মনমোহন বিদায়ের বাজনা বাজিয়েছেন। অন্যদিকে দাঙ্গার ঠিকানা খুঁজতে এখন আপনাকে যেতে হবে তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষবাদী রাজ্যে। কিন্তু গুজরাটে নয়।

বিশেষ নিবন্ধ

প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য একমাত্র নরেন্দ্র মোদীই যোগ্য কেন?

নবকুমার আদক

আর মাত্র কয়েক সপ্তাহ পরেই কেন্দ্রে সরকার গঠিত হবে। সুনাগরিক হিসাবে আমাদেরই দায়িত্ব এমন ব্যক্তি বা দলকে ভোট দেওয়া যাতে এমন একটি সরকার গঠিত হতে পারে যেটি হবে স্থায়ী এবং পরবর্তী পাঁচ বছর দেশকে সমৃদ্ধ করবে, সমস্ত মানুষের দুঃখ দুর্দশা দূর করবে, শক্তিশালী বৈদেশিক নীতি গ্রহণ করবে এবং দেশকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। পণ্ডিতেরা বলেন চিন্তা ভাবনা করে সঠিক দলকে ভোট দিতে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে যে প্রায় প্রতিটি দলই নৈতিক দিক থেকে অধঃপতিত এবং আর্থিক লুটতরাজে নিমজ্জিত। সুনাগরিকরা এদেরকে ভোট দেবেন না। বেশির ভাগ দলই আঞ্চলিক। এদেরকে ভোট দেওয়ার অর্থ আঞ্চলিকতাকে প্রশ্রয় দেওয়া যা জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী। বেশিরভাগ আঞ্চলিক দলই সাম্প্রদায়িকতা ও জাতপাতের এমনকী এথনিক স্বার্থবুদ্ধি প্রণোদিত। কেন্দ্রীয় সরকারকে দুর্বল করাই এদের কাজ। ক্ষমতার অপব্যবহার করে এরা নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করে, তাতে দেশের, দশের কী ক্ষতি হলো তা নিয়ে এরা ভাবিত নয়। ইদানীং NOTA নামে একটি বোতাম EVM ভোটযন্ত্রে যুক্ত হয়েছে। এর অর্থ হলো প্রার্থীদের কাউকেই পছন্দ নয়। এই অভিমত জানানো আর ভোট না দেওয়া একই ব্যাপার। কোনো না কোনো দলকে সরকার গড়তে দিতে হবে। অতএব ভোট নষ্ট না করে যোগ্য দলকে ভোট দেওয়াই ভাল। নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা পার্টি সর্ব অর্থেই অন্য যে কোনো আঞ্চলিক অথবা জাতীয় দল অপেক্ষা অধিকতর যোগ্য জাতীয় দল হিসাবে পরিগণিত। ধনী-নির্ধন, নারী-পুরুষ,

সম্প্রদায়, জাতপাত এবং গোষ্ঠীগত একপেশে অন্ধ এবং গোঁড়ামির ঊর্ধ্বে উঠে সত্যকার সমদর্শিতা ও সমস্ত মানুষের নায্য স্বার্থ ও অধিকার সুনিশ্চিত করার আদর্শ নিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি পথ চলতে শুরু করেছিল। ক্ষমতায় থেকেও এই আদর্শ থেকে একটুও বিচ্যুত হয়নি।

দুটি জাতীয় দল কেন্দ্রে সরকার গড়ার লক্ষ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। ভারতীয় জনতা পার্টি ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। গত দশ বছরের কংগ্রেস শাসনে ভারতের অর্থনীতি তলানিতে এসে ঠেকেছে, মানুষ কাজ হারিয়েছে, সরকারের দয়ার দানের উপর নির্ভর করে একবেলাও গ্রাসাচ্ছাদন করা যায় না। অর্থনৈতিক বৈষম্য ভীষণ রকম চোখে পড়ছে। নেতা মন্ত্রীরা সরকারি কতরকম ভাবে এবং কে কার থেকে বেশি অর্থ তছরূপ করতে পারে তার প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছে। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিচার-এর ক্ষেত্রে ন্যূনতম সীমার নীচে থাকাটাই অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রে দস্তুর হয়ে গেছে। মত পথ নির্বিশেষে প্রায় প্রত্যেকে দল ক্ষমতায় থাকার প্রয়োজনে সাম্প্রদায়িকতা এবং জাতপাতের ভাবনাকে এমন তোষণ করছে যে ভারতে আবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং তার ফলস্বরূপ বিভাজনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এই মারাত্মক আত্মহননের পথ থেকে ভারতকে রক্ষা করার মন্ত্রে ভারতীয় জনতা পার্টি দীক্ষিত।

সাম্প্রতিক একটি বক্তৃতায় রাহুল গান্ধী বলেছেন যে ক্ষমতায় এলে তাঁর দল বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং পিছিয়ে পড়া জাতি এবং উপজাতির জন্য সংরক্ষণ বাধ্যতামূলক করে দেবে। এর ফল হবে মারাত্মক। সমস্ত প্রতিষ্ঠানেই সাম্প্রদায়িকতা ও জাতিবিদ্বেষ মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। তাতে অবশ্য কংগ্রেসের কিছু যায় আসে না, কারণ স্বাধীনতার সময় থেকেই সাম্প্রদায়িকতা ও জাতিবিদ্বেষ ভাঙিয়েই ক্ষমতায় থেকেছে। ভারতীয় জনতা পার্টি সংরক্ষণের থেকে বেশি জোর দেয় ক্ষমতায়নে। সবাইকেই যোগ্য করে তুললে সংরক্ষণের প্রয়োজন পড়ে না। ভারতীয় জনতা পার্টি কর্মসংস্থান বৃদ্ধির উপরেও জোর দেয়, যাতে সংরক্ষণের মাধ্যমে যোগ্য ব্যক্তিকে বঞ্চিত করে কাজ কেড়ে নিতে না হয়।

অনেকে বলেন নরেন্দ্র মোদী গুজরাটে কারখানা মালিকদের অনেক ট্যাক্স ছাড় দিয়েছেন। কথাটা সত্যি, কিন্তু তাতে রাজ্যের আর্থিক ক্ষতি হয়নি, বরং ভবিষ্যতে আয়ের সুযোগ তৈরি হয়েছে। কারখানা স্থাপনের শুরুতে কোম্পানির আয় হয় না, বরং অনেক খরচ হয়। ট্যাক্স ছাড় না দিলে কেউ কারখানা করতেও চায় না। যে ট্যাক্সের কথা বলা হচ্ছে তা আগে থেকেই সরকারের আয় ছিল না। কারখানা গড়লে তবেই এই ট্যাক্সটা সরকারের প্রাপ্য হয়। কয়েক বছর ট্যাক্স ছাড় দিলে যদি কেউ কারখানা স্থাপন করতে রাজি হয়, তাহলে অন্তত ছাড়ের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর সরকার ওই ট্যাক্সটা পেতে থাকবে। এছাড়া কারখানা হলে অন্যান্য

ব্যবসাবাণিজ্য ও সহকারী শিল্প গড়ে ওঠে, সেটা উপরি লাভ।

কংগ্রেসের বর্তমান নীতি হলো কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি না করে সরকারের টাকায় দানছত্র খুলে ভোট আদায় করা। এতে করে যদি সরকারের এবং দেশের অর্থনীতি জলাঞ্জলি যায় তাতে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। বিভিন্ন প্রকার দান খয়রাত না করে সেই অর্থের বিনিময়ে যদি রাষ্ট্রের কাজে সক্ষম ব্যক্তির কাছ থেকে কায়িক বা মানসিক শ্রম আদায় করা যেত, তাহলে অভাবী ব্যক্তির উপকারের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় অনেক কাজও সম্পন্ন হোত। এইভাবে একদিকে যেমন কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেত তেমনই রাষ্ট্রের সম্পদ তৈরি হোত এবং রাষ্ট্রের সম্পদ বা অর্থ অযথা অপচয় হোত না। রাষ্ট্রও অথর্ব ও অক্ষম ব্যক্তিদের সম্পূর্ণ দেখভালের দায়িত্ব নেওয়ার মতো আর্থিক ক্ষমতা সম্পন্ন হোত।

মোদীর উজ্জ্বল ভারতের স্বপ্ন ও পরিকল্পনা :

গোটা দেশের বর্তমান অর্থনীতি অবস্থা ক্রমশই খারাপ থেকে খারাপতর হচ্ছে। শাকসব্জি, খাদ্যদ্রব্য, পেট্রোলিয়াম ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সহ সমস্ত জিনিসের দাম আকাশচুম্বি হয়ে উঠছে। ডলারের দাম টাকার তুলনায় ক্রমবর্ধমান। ক্রমবর্ধমান কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেফিসিট আমদানি রপ্তানির উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলছে। 2G, Coal scam, CWG প্রভৃতি অর্থনৈতিক কেলেঙ্কারি কংগ্রেস দলের শাসনের প্রতি মানুষকে বিদ্বিষ্ট করে তুলেছে। সে সব সমস্যা অতি দ্রুততার সঙ্গে মোকাবিলার প্রয়োজন সেগুলি হলো অবশিল্পায়ন, বিনিয়োগ হ্রাস, বাজেট ঘাটতি, দ্রুত মূল্যবৃদ্ধি প্রভৃতি। প্রাকৃতিক শক্তি ব্যবহারেও ভারতের স্বনির্ভর হতে হবে। নরেন্দ্র মোদী মনে করেন তাপবিদ্যুতের জন্য বাইরে থেকে কয়লা আমদানির উপর অতিরিক্ত নির্ভরতার জন্যই কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেফিসিট বৃদ্ধি পাচ্ছে। মোদীজী মনে করেন কয়লানির্ভর শক্তির উপর নির্ভর না করে পুনরায় উৎপাদনযোগ্য শক্তির উপর নির্ভর করা উচিত। ক্ষমতায় এলে তিনি পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে জলবিদ্যুৎ, পশ্চিম ভারতে সৌরবিদ্যুৎ এবং দক্ষিণভারতে বায়ুবিদ্যুৎ-এর ব্যবস্থা করবেন।

তাঁর অন্যান্য পরিকল্পনাগুলি হলো : সর্বাধুনিক জ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যা আহরণের জন্য শিক্ষকদের বিদেশে পাঠানো, ভারতের অর্থনীতির জন্য বিদেশী বিনিয়োগকারীদের সুযোগ বৃদ্ধি প্রভৃতি। উৎপাদন শিল্প, কৃষি ও পরিষেবা এই তিনটি উন্নয়নের তিনটি স্তম্ভ বলে তিনি মনে করেন। গবেষণা ও উন্নয়ন, বৌদ্ধিক সম্পদের অধিকার, পেটেন্টের মাধ্যমে ভারতীয় সম্পদ রক্ষার উপরেও তিনি জোর দিয়েছেন। বিনিয়োগ নির্ভর উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান, দক্ষতা এবং শিক্ষার উন্নতি ২০১৫ সালের মধ্যে তিনগুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব বলে মোদীজী মনে করেন। যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য রাস্তাঘাট, রেলপথ, প্রাকৃতিক শক্তি এবং পোতাশ্রয় নির্মাণ অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে করা সম্ভব। বুলেট ট্রেনের 'হীরক চতুর্ভুজ' গড়া তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য। কৃষিজ পণ্য সংরক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত গোলা, ঠাণ্ডা ঘর তৈরির সঙ্গে সঙ্গে একটি 'price stabilization fund' তৈরি করার উপরও মোদীজী জোর দিয়েছেন, যাতে করে শস্যহানি হলে বা পণ্যের দাম অস্বাভাবিক হ্রাস বা বৃদ্ধি পেলে চাষি অথবা ক্রেতা কেউই ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। গরিবরা যাতে অন্তত দুবেলা খেতে পায় তার জন্য উৎপাদনমুখি ও স্থায়ী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থার উপর তিনি জোর দিয়েছেন। এসব সম্ভব হবে যদি এমন একটি সরকার গঠিত হয় অভিজ্ঞতা, দক্ষতা এবং সদিচ্ছা আছে, আর একমাত্র গুজরাটের মোদী সরকারেরই তা আছে। মোদীজীর প্রিয় শব্দ হল 'trusteeship'। এমন একটি সরকার গড়তে হবে যার উপর নিঃসংশয়ে ভরসা করা যায়। তাঁর মতে শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর ক্যাবিনেট নয়, সংশ্লিষ্ট রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে যৌথভাবে আলাপ আলোচনা ও পরিকল্পনা করে কাজ করলে তবেই দেশের সার্বিক উন্নতি দ্রুততার সঙ্গে করা সম্ভব।

কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলির সমন্বয়ের মাধ্যমেই তিনি ১০০টি smart city এবং প্রতিটি রাজ্যে একটি করে Indian Insrtitutes of Technology (IITs), the Indian Institutes of Management (IIMs) and the All India Institutes of Medical Scieneces (AIIMS) ; এবং সর্বভারতীয় স্তরে কর্মসংস্থান, কৃষকদের জন্য উন্নয়নের মডেল, water grids ; gas grid, national optical fibre networks তৈরির উপর জোর দিয়েছেন। ট্যাক্স ব্যবস্থার সংস্কার এমনভাবে করতে হবে যাতে তা সহজবোধ্য হয় এবং সাধারণের উপর চাপ না পড়ে অথচ সরকারের আয় বৃদ্ধি পায়। বর্তমান ট্যাক্স ব্যবস্থার বদলে তিনি গোটা ভারতে একই হারে goods and services tax ধার্য করার পক্ষপাতি। ভারতীয় জনতা পার্টির অনেকদিনের লালিত দুটি ইচ্ছে— সমস্ত নদীগুলির সংযোগ সাধন এবং বিদেশী ব্যাঙ্কে ভারতীয়দের গচ্ছিত টাকা ফিরিয়ে আনা। আকরিক লোহা রপ্তানি করে লোহাজাত দ্রব্য আমদানির বদলে লোহাজাত দ্রব্য রপ্তানি করলে বৈদেশিক বাণিজ্যিখাতে ডলার সাশ্রয় হবে।

কৃষি, পরিষেবা, উৎপাদন এইরকম বহু ক্ষেত্রেই আরো অনেক লোকের প্রয়োজন। অথচ ভুল অর্থনৈতিক পরিকল্পনার জন্য আমাদের বহু লোককেই কাজে নিযুক্ত করা হয়নি। সঠিক নীতি নির্ধারণ করে সবাইকেই কাজে নিয়োগ করতে হবে। তাহলে একদিকে যেমন কেউ বেকার থাকবে না তেমনই ভারতের উন্নতি খুব দ্রুত বৃদ্ধি পাবে। ক্ষমতা প্রকল্পের (skill development program) মাধ্যমে আগামী দশ বছরের মধ্যে ২০ কোটি লোককে উপযুক্তরূপে প্রশিক্ষিত করা সম্ভব বলে মোদীজী মনে করেন। তাহলেই তথ্য, উদ্ভাবন ও প্রকৌশলগত জ্ঞানে ভারতে বিশ্বে এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারবে। গত ২০ মার্চ মোদীজী গোটা ভারত জুড়ে 'চায় পে চর্চা'-র আসরে প্রধানত কৃষি ও কৃষকদের বিষয়েই তাঁর পরিকল্পনার কথা বলেছেন। তিনি মনে করেন কৃষিক্ষেত্রে পরিকাঠামোগত উন্নতি করা এবং ভিন্ন ভিন্ন চাষের এলাকার প্রত্যেকটিতে একটি করে কৃষি বিষয়ক দপ্তর থাকবে যাদের কাজ হবে

তাদের নিজ নিজ এলাকার কৃষি সংক্রান্ত প্রাকৃতিক বিপর্যয়, জমির গুণমান, এলাকাবাসীর চাহিদা, সেচব্যবস্থা, ফসল সংরক্ষণ ও বিপণন প্রভৃতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া। কৃষকের যাতে ক্ষতি না হয় সে কথা মাথায় রেখে উপযুক্ত কৃষিবীমা, অবদান বা ছাড়ের ব্যবস্থা করা। কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য Genetically Modified seeds-এর ব্যবহারের উপর তিনি জোর দেন।

মোদীজীর লক্ষ্য হলো 'Maximum governance, minimum government'।

নতুন দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ২০১৪-র অর্থনীতিক কনভেনশনে সুবীর গোকর্ণ (Director, Research Brookings India) এবং R Seshasayee (Non-Executive Vice Chairman, Ashok Leyland) বলেন যে মোদীজীর কাজ করার ইচ্ছার কাছে কোনো কিছুই অসম্ভব নয়। "Willingness is what you are currently looking at. The ability is going to come later." মোদীজীর ইচ্ছা হলো justice should reach "unto the last man of the society"। সুশাসন ব্যবস্থা কায়েম করে তিনি যত লক্ষ লক্ষ কেস আদালতে বিচারাধীন হয়ে পড়ে আছে তার দ্রুত নিষ্পত্তি চান। প্রয়োজন হলে টিভি সম্প্রচারের মাধ্যমে বিচার প্রক্রিয়া দেখিয়ে জনগণকে এবিষয়ে শিক্ষা দিতে চান। মোদীজীর স্লোগান হলো, "less government and more governance" এবং "people public private partnership"। তিনি আরও মনে করেন, "Government is all about outlay, governance is all about outcome. Government is all about power, governmance is all bout empowerment. Government means rules and regulations while governance means delivery"। মোদীজী ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের বেসরকারিকরণ চান। এইসব ক্ষেত্রে সরকারি হস্তক্ষেপ এড়াতে, কিন্তু একইসঙ্গে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির উপরও তিনি জোর দিয়েছেন।

মোদীজীর বিদেশনীতি :

অরুণাচল প্রদেশকে চীন তার অধিকৃত তিব্বত ভূখণ্ডের দক্ষিণ অংশ মনে করে ওই প্রদেশটাকে নিজের অংশ বলে ঘোষণা করছে। ইতিমধ্যে বহুবার বিনা প্ররোচনায় ওই অংশে সীমান্ত লঙ্ঘন করেছে। মোদীজী চীনের অনুপ্রবেশের কড়া সমালোচনা করেছেন। সম্প্রতি অরুণাচল প্রদেশের এক সভায় তিনি জোরের সঙ্গে বলেছেন, "No power on earth can take away even an inch form India"। তিনি স্বদেশের নামে শপথ করে বলেন, "I will not let this nation [India] be destroyed, I will not let this nation be divided, I will not let this nation bow down." ভারতের বিদেশনীতি বিশেষজ্ঞ যশোবন্ত সিং মনে করেন মোদীজী দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানের সঙ্গে যৌথভাবে চীনের বিরুদ্ধে নিরাপত্তাবলয় গড়ে তুলতে পারেন। অতীতে পাকিস্তানি মুসলমান সন্ত্রাসবাদীদের ভারতে জঙ্গি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে মোদীজী হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। ভূতপূর্ব ভারতের রাষ্ট্রদূত রাজীব ডোগরা মনে করেন যে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার গড়তে পারলে ভারতীয়দের আশা আকাঙ্ক্ষার কথা এবং এই অঞ্চলের উত্তেজনার কথা মাথায় রেখে পাকিস্তানের প্রতি অপেক্ষাকৃত কড়া মনোভাবই গ্রহণ করবেন।

ভ্রমণ পিপাসু বাঙালীর নির্ভরযোগ্য সঙ্গী

Sharada Travels

শারদা ট্রাভেলস্

ফুলেশ্বর, উলুবেড়িয়া, হাওড়া

প্রত্যুষ মন্ডল — 9874398337

গ্রীষ্মকালীন ভ্রমণ সূচী ২০১৪

ভ্রমণ	মুখ্য দর্শনীয় স্থান	দিন	শুভ যাত্রা	প্যাকেজ মূল্য
কাশ্মীর	জম্মু, শ্রীনগর, গুলমার্গ, সোনমার্গ, পহেলগাঁও, বৈষ্ণোদেবী	১৩	১৭ই মে	১৪,৫০০/-
দার্জিলিং	টাইগার হিল, ঘুম মনেস্ট্রী, বাতাসী, মিরিক	৬	৩০শে মে	৬,০০০/-
সিমলা	সিমলা, কুফরি, মানালী, রোটাংপাস, কুলু, মনিকরন	১১	১৮ই মে	১১,২০০/-
হরিদ্বার	হরিদ্বার-হৃষিকেশ, লক্ষ্মনঝোলা, দেরাদুন, মুসৌরী	৮	২৭শে মে	৬,২০০/-

ট্রেনের টিকিট নিশ্চিত করতে অবশ্যই যাত্রা শুরুর তিন মাস আগে যোগাযোগ করুন অথবা ডাকুন।

প্যাকেজে থাকছে :- ট্রেনে (স্লিপার ক্লাস), বড়/ছোট গাড়ীতে যাতায়াত, সাইড সিইং, সকালে চা টিফিন, লাঞ্চ,ডিনার (আমিষ/নিরামিষ),টোল ট্যাক্স,গাড়ী পার্কিং, ফ্যামেলি অনুযায়ী রুম।

প্যাকেজে থাকছে না :- ট্রেন চলাকালীন কোন রকম খাবার, এন্ট্রি ফি, কুলী ভাড়া,ক্যামেরা চার্জ, নৌকাবিহার, রোপওয়ে,হাতি/ঘোড়া চাপা, পুজো দেওয়া, ব্যক্তিগত ব্যবহারের গাড়ি ভাড়া।

স্কুল, কলেজ ও গ্রুপ টুরের জন্য যোগাযোগ করুন।

✷ ভ্রমণ শুরু ও শেষ, হাওড়া/শিয়ালদহ/ কোলকাতা অথবা উল্লেখ্য নির্দিষ্ট কোন স্থান থেকে ✷ হঠাৎ করে যানবাহনের ভাড়া বৃদ্ধি অথবা ভ্রমণ সম্পর্কিত বিষয়ে মূল্যবৃদ্ধি ঘটলে প্যাকেজ মূল্য বর্ধিত হবে। ✷ বালক / বালিকাদের ক্ষেত্রে (৫-১১ বৎসর) প্যাকেজ মূল্যের ৭৫% টাকা লাগবে। শিশুদের ক্ষেত্রে (২-৪ বৎসর) প্যাকেজ মূল্যের ২৫% টাকা লাগবে।

চিঠিপত্র

সংখ্যালঘু ভোট

লোকসভা নির্বাচনে জাতীয়স্তরে কংগ্রেসকে সমর্থনের জন্য মুসলিম সম্প্রদায়ের কাছে জামা মসজিদের শাহি ইমাম সৈয়দ আহমেদ বুখারির আবেদন রাখা নিন্দনীয় ঘটনা। এ রাজ্যে আবার কংগ্রেসকে প্রত্যাখান করে তৃণমূলের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে দু-মুখো নীতির পরিচয় দিয়েছেন তিনি। কিন্তু সাধারণ নির্বাচনে একটা বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতি এধরনের ফতোয়া জারি করা কি সাম্প্রদায়িকতা নয়? এহেন আচরণ গণতন্ত্র বিরোধী বললেও অত্যুক্তি করা হয় না। বরং লোকসভা নির্বাচনে নির্দিষ্ট দলকে সমর্থনের ইস্যুতে দিল্লীর শাহি ইমামের বক্তব্যের নিন্দা করায় এ রাজ্যের ইমামদের কিছুটা শুভবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। এই আবেদন শরিয়ত বিরোধীর সঙ্গে তুলনীয়। এ রাজ্যের ইমামদের এই বিরোধিতাকে সাধুবাদ জানাতে হয়। আর ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের জন্য নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের প্রতি ফতোয়া জারি করার মাধ্যমে সাংবিধানিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়। তবে এ রাজ্য তথা দেশে মাত্রাছাড়া সংখ্যালঘু তোষণের ফলেই শাহি ইমাম এ ধরনের ফতোয়া জারি করার সাহস পান তা বলা যায়। সংখ্যালঘু তোষণের মাধ্যমে মুসলমান ভোটব্যাঙ্ক করায়ত্ত করা এ রাজ্যের তথা দেশের তথাকথিত স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক দলগুলোর অন্যতম লক্ষ্য থাকে। আর এরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী তো সর্বদাই উদার মানসিকতা নিয়ে থাকেন মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য। তাই দিল্লীর শাহি ইমাম যে এ রাজ্যে তৃণমূলের তোয়াজ করবেন এর মধ্যে অস্বাভাবিকতা নেই। কিন্তু সম্প্রতি লোকসভা নির্বাচনে বিভিন্ন দলের নেতা নেত্রীর প্রার্থীর নির্বাচন বিরোধী কিছু বক্তব্যের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনের শোকজ করা সঠিক পদক্ষেপ। তাহলে একটা জামা মসজিদের প্রধানের এহেন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কেন নির্বাচন কমিশন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করল না? হিন্দুধর্ম, রামমন্দির ইস্যু নিয়ে নির্বাচনের প্রাক্কালে হিন্দু ভোটারদের প্রভাবিত করলেই তা নির্বাচন-বিরোধী কাজ হয়ে যায়? তখন তথাকথিত রাজনৈতিক নেতা নেত্রীরাও সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ পান। আর মুসলমান ভোটব্যাঙ্ক করায়ত্ত করতে সংখ্যালঘু তোষণে দিলদরিয়া হলেও কিছু যায় অসে না। এটা কি বৃহত্তর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ধর্মনিরপেক্ষতার নমুনা? তবে রাজ্য তথা দেশের রাজনীতি সচেতন মানুষ জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দলের সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন তা বলাই বাহুল্য। তাই সংখ্যালঘু ভোটেও ইমামদের ফতোয়াজারি যে গুরুত্বহীন তা বলা যেতেই পারে।

—সমীর কুমার দাস,
দ্বারহাট্টা, হুগলী।

নরেন্দ্র মোদী এত বিষ হজম করতে পারবেন তো?

এদেশের প্রায় সব জনমত সমীক্ষায় এমনকী কয়েকদিন আগে ভয়েস অব আমেরিকার খবরে শুনলাম যে সেদেশের একটি সংস্থার সমীক্ষায়ও বলছে যে এবার লোকসভায় নির্বাচনের পর বিজেপি-র নরেন্দ্র মোদী-র প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। আগামী ১৬ মে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হবে। আমার জিজ্ঞাস্য, নরেন্দ্র মোদী ততদিন বেঁচে থাকবেন তো? আমার এই সন্দেহের কারণ— কয়েকমাস আগে প্রথমে মোদী বিজেপি-র প্রচার প্রমুখ পরে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসাবে ঘোষণার পর থেকে যে ভাবে দেশের প্রায় সব রাজনৈতিক দলের, সব রকম মিডিয়ার ও সমাজের নানা শ্রেণীর মানুষের গোলাগুলি মিসাইল স্বরূপ তীব্র ভাষায় গালিগালাজ ও নিন্দামন্দ চলছে তার পর কারো পক্ষে সুস্থ শরীরে বেঁচে থাকা সম্ভব? কে নেই তাতে এবং কি সব কড়া কড়া বিশেষণ মোদীর বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হচ্ছে— দাঙ্গাবাজ, দাঙ্গার মুখ, দাঙ্গার রক্তের হাত, মওত কা সদাগর, দাঙ্গা মোদী, খুনী, হিটলার, ঔরঙ্গজেব, চেঙ্গিস খাঁ, অসভ্য, বর্বর, নরখাদক, কুকুরের বাচ্চা ইত্যাদি অভিধানে (এমনকী অভিধানে যা নেই তাও) যত খারাপ বিশেষণ আছে সেসব বিরামহীন ভাবে নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হচ্ছে। চুনোপুঁটি থেকে রাঘব বোয়াল, রাজনৈতিক নেতা থেকে সমাজকর্মী, সাহিত্যিক থেকে বুদ্ধিজীবী, নিরক্ষর থেকে নোবেলজয়ী, বলিউডের তারকা থেকে রাস্তার ফোক ড্যান্সার কে নেই তাতে? বিসিসির খবরে শুনলাম যে এদেশের ৬০ জন সাহিত্যিক— যার মধ্যে সেই সলমন রুশিদিও আছেন--- লন্ডনের ডেলি টেলিগ্রাফে চিঠি লিখে জানিয়েছেন যে মোদী প্রধানমন্ত্রী হলে দেশের সর্বনাশ হবে। লন্ডনের গার্ডিয়ান পত্রিকাও এক লম্বা প্রবন্ধ লিখে সেই একই অভিমত প্রকাশ করেছে। লালুপ্রসাদ যাদব তো হুমকি দিয়েই চলেছেন যে প্রাণ থাকতে তিনি কিছুতেই মোদীকে প্রধানমন্ত্রী হতে দেবেন না। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুদিন চুপ করে থেকে এখন সভা সমিতিতে নিয়ম করে নরেন্দ্র মোদীকে দাঙ্গাবাজ, দাঙ্গারমুখ ইত্যাদি বলে গালি দিয়ে চলেছেন। মোদীকে হত্যা করার জন্য তাঁর পাটনার জনসভায় বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছিল। ভাগ্যক্রমে তিনি সেদিন বেঁচে গিয়েছিলেন, কিন্তু তার পরেও তাঁর বিরোধীরা বসে নেই। উত্তরপ্রদেশের সাহারানপুরের কংগ্রেস প্রার্থী ইমরান মাসুদ তো নরেন্দ্র মোদীকে কেটে কুচি কুচি করার হুমকি দিয়েছেন। এরপর বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে যাচ্ছে যে নরেন্দ্র মোদীর পক্ষে আগামী ১৬ মে পর্যন্ত বা তার পরবর্তী সময়ে বেঁচে থাকা সম্ভব কিনা। যদি তা থাকতে পারেন তবে সেটা হবে এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা। কারণ নরেন্দ্র মোদী আজ পর্যন্ত যত বিষ হজম করেছেন স্বয়ং দেবাদিদের নীলকণ্ঠ মহাদেবকেও এত বিষ হজম করতে হয়নি।

—সুহাস বসু,
বেহালা, কলকাতা-৬০।

আমার আপনার দুর্দিনে গণতন্ত্রের কি আসে যায়!

সমীর কুমার পড়্যা

প্রতিদিন বর্ধমান স্টেশন থেকে কর্ডলাইনের ট্রেন ধরে হাওড়া হয়ে শহর কলকাতায় পৌঁছে যান শিবু দাস, হেমন্ত যাদব, তপু সামন্তরা। ওরা সহ আরো বেশ কয়েকজন ভোররাত থেকে ছানার বাঁক কাঁধে করে ভিড় জমায় ট্রেন ধরার জন্য। কলকাতার নামীদামি মিষ্টান্ন প্রস্তুতকারীদের ভিয়েনে সারাবছর রসদ জোগায় শিবু, হেমন্ত, তপুরা। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা ওদের কোনো ছুটি নেই। পেট আর সংসারের টানে কাজে যেতেই হয়। যে গণতন্ত্র নিয়ে গর্ব করি আমরা, ওদের কাছে আমাদের অতি গর্বের গণতন্ত্রের অন্য কোনো অর্থ নেই। ক'দিন আগে ভারতের সাধারণতন্ত্র দিবসের দিন অত্যন্ত সহজ ও আন্তরিকভাবে জানতে চেয়েছিলাম গণতন্ত্রের অর্থ বলতে ওরা কী বোঝে। এই লেখার শিরোনামটা ওদের বলা কথা থেকেই নেওয়া। সত্যিই কি আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে গণতন্ত্র শুধু ভারী ভারী শব্দ ছাড়া অন্য কিছু বার্তা আনে? বোধকরি নয়।

স্বাধীনতার আন্দোলনে যাঁরা দেশের জন্য নিজেদের বলি দিয়েছিলেন তাঁরা হয়তো কেউই আজকের এই গণতন্ত্র চাননি, এ কেমন গণতন্ত্র যেখানে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে গেলে মাঝ রাস্তায় বন্দুক উঁচিয়ে একদল বাড়ি পাঠিয়ে দেন, যাঃ বাড়ি যা, তোর ভোট হয়ে গেছে। আজকে বাজারে যে জিনিসের দাম ৩০ টাকা, আগামীকাল ওই জিনিসের দাম যে ২০০ টাকা হবে না রাষ্ট্র কোনো নিশ্চয়তা দিতে পারবে কি? বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমার মা, আপনার বোন ফিরতে পারবে কি! না, রাষ্ট্র কোনো সদুত্তর দিতে পারবে না, এদেশে তো প্রশ্ন করাই সাহসের সীমা লঙ্ঘন করা, নেত্রী আঙুল দেখিয়ে বলবে, 'চুপ! কোনো কথা হবে না।'

পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশের সিংহভাগ কৃষক, শ্রমজীবী মানুষ কেমন আছেন, যাদের দিন এনে দিন খেতে হয়? হয়তো জানেন না কিংবা জানলেও সত্যিটা জানেন না, উল্টো দিকে বলতে গেলে আপনাকে সত্যিটা জানানো হয় না, প্রশাসন তো শুধু গদিটাই বোঝে, যেমন করেই হোক ক্ষমতা চাই। এবছর দীপিকা পাড়ুকোনের কতগুলো সিনেমা হিট করেছে আপনি জানেন, ক্যাটরিনা কাইফ কিংবা বলিউড অভিনেত্রীরা কার সঙ্গে সমুদ্র সৈকতে বেড়াতে গেছে আপনি জানেন, ও হ্যাঁ, প্রাইম টাইমে কোন সিরিয়াল যেন হাজার এপিসোড পার করলো? আপনি জানেন। যেটা জানেন না সেটা হলো গতকাল সারাদিনে ভারতের কোথায় কতজন কৃষক আত্মহত্যা করেছে দেনার দায়ে কিংবা সংসার চালাতে না পেরে কিংবা আজ সারাদিনে কোথায় ক'জন হতভাগ্য বাধ্য হবে কৃষিকাজের জন্য আনা বিষেই সুইসাইড করার মতো চরম সিদ্ধান্ত নিতে। সবকিছু জেনে নিলে যে প্রশাসনের বিরুদ্ধে আপনি প্রতিবাদ করবেন তাই তা হাতে দেওয়া যায় না।

আপনি যেমন আছেন তেমন থাকুন। বেশি বাড়াবাড়ি করবেন না। রাষ্ট্রের কাছে জানতে চাইলে শিলাদিত্যের মতো মাওবাদী তকমা দিয়ে জীবন বিপন্ন করে দেওয়া হবে। তথ্য জানতে চাইলে নির্ঘাত গুলিতে বেঘোরে মরতে হবে। ও হ্যাঁ, ভারতে মঙ্গল অভিযান তো সফল হলো, কত কোটি টাকা খরচ হলো যেন? ও আপনি জানেন। কিন্তু এই ক'দিন সারা দেশে ক'টা শিশু বিনা চিকিৎসায় মারা গেছে আপনি জানেন না। আইপিএলের নিলামে কে যেন সর্বোচ্চ দর পেল? আপনি জানেন। আপনার বাড়ির টেলিভিশনের পর্দায় কাল সারাদিন কতবার যুবরাজকে দেখলেন? বর্তমান আর্থিক বছরে কোনো সাংসদ কত কোটি টাকা স্রেফ পরিকল্পনার অভাবে খরচ করতে পারলো না। একবারও দেখালো কি? হাজার হাজার কোটি টাকার দুর্নীতিতে অভিযুক্ত পেটোয়া পাবলিক লিগ (আই পি এল) নিয়ে আমার আপনার মাথা ঘামানোর দরকার কি? তার জন্য বোর্ড আছে। সরকার আছে। আপনি প্রশ্ন তুলতেই পারবেন না। গত আর্থিক বছরে দরিদ্রদের উন্নয়নে দেশে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছে তার বহুগুণ অর্থ টাটা-বিড়লা- আম্বানিদের কর বাবদ দেশের কোষাগারে জমা হওয়ার কথা যে টাকা, আমাদের জনদরদি সরকার মুকুব করে দিয়েছে। খোঁজ নিয়ে জানুন।

পাড়ার মোড়ে যে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ ছেলেটা কোনোরকমে ধার-দেনা করে একটা গুমটি বানিয়ে চাউমিনের দোকান বসাতে চেয়েছে তার মাথায় হাত, ভর্তুকিহীন সিলিন্ডারের দাম একলাফে কত টাকা বাড়লো! আর পুঁজিটাও বা পাবে কোথায়? কোনো ব্যাঙ্কই লোন দেয়নি। ওই ছেলেটার ভবিষ্যৎ নিয়ে মাথা ঘামাবে কে? শাহরুখ খান কি কলকাতা পুরসভার সব ট্যাক্স জমা করেছে? নাকি পুরসভা মুকুব করলো? স্বাধীনতা দিবস, সাধারণতন্ত্র দিবস প্রভৃতি দিনের তাৎপর্য কি আমরা বুঝতে পারছি এই দুর্দিনে? অন্যদিনের থেকে কোথায় আলাদা? ইদানীং তো আবার একটা জিনিস লক্ষ্য করছি, ওই দিনগুলোয় ছুটি পেয়ে পার্টি করার দিন। স্বাধীনতার এত বছর পর সরকারকে কেন ৮০ কোটি জনগণের খাদ্যের অধিকারকে আইন করে স্বীকৃতি দিতে হয়? প্রশ্নটা অবান্তরও নয়। সবাই একটু ভাববেন কি আমরা কোন পথে চলেছি? আমাদের ভবিষ্যৎটা কি?

চিরনূতনকে ডাক দেওয়া পঁচিশে বৈশাখ

জীবন সূর্য অস্তাচলের দিকে ঢলে পড়েছে, ম্লান ছটা তাঁর জীবনে অন্যরকম আলোর বিচ্ছুরণ ঘটাচ্ছে। অনেক কাজ দায়িত্ব প্রতিদিন সামলাতে হচ্ছে। তার মধ্যে রয়েছে লেখালিখি। 'পূরবী' কাব্য প্রকাশিত হলো। তার একটি কবিতার নাম 'পঁচিশে বৈশাখ'। দীর্ঘ কবিতা। ১৯২২ সালের ৮ মে কবিতাটি লেখা। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ৬১ বছর। ওই কবিতার মধ্যে অনেক কথা বলা। শুরু হচ্ছে 'পঁচিশে বৈশাখ চলেছে জন্মদিনের ধারাকে বহন করে মৃত্যুদিনের দিকে।' অসাধারণ ভাবনা চির সত্যের আলোতে। জীবন তো এগিয়ে যায় একটু একটু করে মৃত্যুদিনের দিকে। মৃত্যু হলো জীবনের চরম সত্য। কিন্তু জীবনের জয়গান গেয়েছেন যিনি তিনি তো বলবেন, 'আমি মৃত্যুর চেয়ে বড়ো।' মৃত্যু চরম সত্যকে রূপ দিতে একসময় আসবেই। তার আগে রয়েছে জীবন প্রবাহের নানামুখী কর্মধারা। সেই কর্মপ্রয়াসই বড়ো পরিচয় রাখে প্রাণবন্ত অস্তিত্বের। যা মৃত্যু পেরিয়ে চিরকালীন রূপ পায়। ৬১তম জন্মদিনে লেখা কবিতাটা বারবার পড়া হয়েছে। উনিশ বছর বাদে রবীন্দ্রনাথের বয়স আশি বছর। জন্মদিনের অনুষ্ঠান হবে। কবির মনে পড়ল 'পঁচিশে বৈশাখ' কবিতাটা। সেটা আবৃত্তি হয়েছে অনেকবার। রবীন্দ্রনাথ নিজে পাঠ করেছেন। ওই কবিতা থেকে যে গান হতে পারে তা আগে কখনও ভাবেননি। পড়তে পড়তে কবিতার শেষ স্তবকে একটু আটকে গেলেন। ভাবলেন সামান্য অদলবদল করে ওই অংশটায় সুর দিলে দিব্যি গান হতে পারে। পঁচিশে বৈশাখ আসতে দুদিন বাকি। ৬ মে ১৯৪১। ২৩ বৈশাখ ১৩৪৮। সুর এসে গেল মনে। গুন গুন করতে লাগলেন। স্বরলিপি করার আগে গানটা শিখিয়ে দিতে চান। শিখে নিলেন কয়েকজন। শান্তিদেব ঘোষ স্বরলিপি করলেন। এটাই রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ গান। এরপর আর কোনো গানে সুর দেননি।

গানটি দেবজিৎ বার বার শুনেছে। প্রতিবারই নতুন মনে হয়েছে। গানের কথাগুলি চোখের সামনে পর পর ভেসে ওঠে। নিজের ৮০তম জন্মদিনে ওই গান গাইল শান্তিনিকেতনের ছেলেমেয়েরা— রবীন্দ্রনাথ চোখ বুজে শুনছেন— এরকম একটা ছবি দেবজিতের মনে স্থায়ীভাবে রয়ে গেছে। কল্পনায় যেন চিরসত্যের রূপ নেওয়া আলোকচিত্র। গানের কথাগুলো তার মনে গাঁথা রয়েছে। 'হে নূতন,/ দেখা দিক আর-বার জন্মের প্রথম শুভক্ষণ।।/ তোমার প্রকাশ হোক কুহেলিকা করি উদ্‌ঘাটন/সূর্যের মতন।/ রিক্ততার বক্ষ ভেদি আপনারে করো উন্মোচন।/ ব্যক্ত হোক জীবনের জয়,/ ব্যক্ত হোক তোমা মাঝে অসীমের চিরবিস্ময়।/ উদয়দিগন্তে শঙ্খ বাজে, মোর চিত্তমাঝে/ চিরনূতনেরে দিল ডাক পঁচিশে বৈশাখ।।'

গানটা খুব ছোট থেকে শুনেছে দেবজিৎ। 'চিরনূতনেরে দিল ডাক পঁচিশে বৈশাখ' এই অংশটা শোনার পর মনে হয় এতো তাকে ডাক দিয়েই লেখা। যদিও তার জন্ম ওই গান লেখার ছাব্বিশ বছর বাদে। দেবজিৎ তার বাবার কাছে শুনেছে ১৯৬১ সালে রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষে গানটি খুব যত্নে গভীর শ্রদ্ধায় বিভিন্ন জায়গায় গাওয়া হয়। সবসময় মনে হয়েছে— এ তো গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজো। কবির জন্মদিনে তাঁকে স্মরণ ও প্রণাম তাঁরই গান গেয়ে। গানটি খুব বড়ো নয়। কিন্তু গভীর কথা সহজ ভাবে বলা। রবীন্দ্রনাথ একবার লিখেছিলেন, 'বস্তুত নিজের জন্মদিন বছরের ৩৬৪ দিনের থেকে নিজের কাছে কিছুমাত্র বড়ো নয়। যদি অন্যের কাছে তার মূল্য থাকে তবেই তার মূল্য।' দেবজিৎ ভাবে আমাদের কাছে দিনটা সম্পূর্ণ অন্যরকম বলেই পঁচিশে বৈশাখের সকালে গানটা বার বার শুনতে হয়। কথাগুলো মন্ত্রের মতো যেন উচ্চারিত হয় আবেগে অনুরাগে অন্য অনুভবে। 'রিক্ততার বক্ষ ভেদি আপনারে করো উন্মোচন/ ব্যক্ত হোক জীবনের জয়,/ ব্যক্ত হোক তোমা মাঝে অসীমের চিরবিস্ময়।' রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন বিভিন্নভাবে যা বলেছেন তারই প্রকাশ গানের মধ্যে। শুরুতেই বলা, 'হে নূতন/ দেখা দিক আর-বার জন্মের প্রথম শুভক্ষণ।/ তোমার প্রকাশ হোক কুহেলিকা করি উদ্‌ঘাটন।/ সূর্যের মতন।' একবারও মনে হয় না রবীন্দ্রনাথ আত্মগৌরবের কথা প্রচার করেছেন গানের মধ্যে। মনে হয় জীবনদেবতার সামনে দাঁড়িয়ে অঞ্জলি ভরে অর্ঘ্য দান। 'এ জীবন পুণ্য করো দহন দানে'— একথা যিনি লিখেছেন এক উপলব্ধির আলোয়। তাঁর কাছে জন্মদিন নেয় অন্য রূপ স্বতন্ত্র অনুভবে। শেষ জন্মদিনে গাওয়া হয়েছিল ওই গান একেবারে টাটকা সুরে। রবীন্দ্রনাথ শুনেছিলেন হয়তো কয়েকবার। বোধহয় জানতেন জন্মদিনের এটাই শেষ অনুষ্ঠান। শরীরের যা অবস্থা তাতে পরবর্তী জন্মদিনের জন্যে প্রতীক্ষা করা যাবে না। পঁচিশে বৈশাখের কয়েক মাস বাদে এলো বাইশে শ্রাবণ। তিন মাসেরও কম। তারপর পেরিয়ে গেলো তিয়াত্তর বছর। এখনও চিরনূতনকে ডাক দেওয়া চলেছে পঁচিশে বৈশাখে। ওই গান দেবজিৎকে উদ্বোধিত করে বার বার।

কুরুক্ষেত্রের সূর্যগ্রহণ মেলা

পরম্পরা

শুভপ্রসন্ন মণ্ডল

অনাদিকাল থেকে ভারতীয় সংস্কৃতির অঙ্গ হিসাবে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষে নদী, পুকুর বা সরোবরে স্নান করার প্রথা চলে আসছে। পুরাণে সূর্যগ্রহণের সময় কুরুক্ষেত্রে ও চন্দ্রগ্রহণের

সময় কাশীতে স্নান ও দানের বিশেষ মাহাত্ম্য বর্ণনা আছে। মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য কুরুক্ষেত্র প্রসিদ্ধ। এখানে সূর্য ও অদিতি বনরূপে বিরাজমান, তাই এই স্থান খুবই মহত্বপূর্ণ। মহাভারত যুদ্ধের আগেও কুরুক্ষেত্রের মহিমা এক প্রসিদ্ধ তীর্থস্থল রূপে ছিল। মহাভারতের বনপর্বে কুরুক্ষেত্রে সূর্যগ্রহণের সময় সূর্য উপাসনার বর্ণনা আছে। উদ্যোগপর্ব, বামনপুরাণ ও ভাগবত পুরাণেও একথা আছে। ধর্মীয় দৃষ্টিতে কুরুক্ষেত্র শুধু ভারতেই নয়, বিশিষ্ট তীর্থস্থল রূপে সারা পৃথিবীতেও বিখ্যাত।

ভারতীয় পরম্পরায় সূর্যপূজা অতি প্রাচীন। সূর্যকে সকল শক্তির উৎস মনে করে শক্তিশালী দেবতা রূপে পূজা করা হয়। পৌরাণিককালে আরম্ভ হওয়া পঞ্চদেবোপসনা অর্থাৎ সূর্য, বিষ্ণু, গণেশ, দুর্গা ও শিব— এর মধ্যে সূর্য উপাসনার বিশেষ মহত্ব আছে। গায়ত্রী ও সাবিত্রীকে সূর্যেরই রূপ মনে করা হয়। ঋগ্বেদে সূর্যকে পৃথিবীর আত্মা বলা হয়েছে। সূর্য পূজার ফলে কৃষ্ণপুত্র শাম্ব কুষ্ঠরোগ থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। বলা হয় কুরুক্ষেত্রে সূর্যগ্রহণের সময় স্নান করলে এক হাজার অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পাওয়া যায় ও মোক্ষ প্রাপ্তি হয়। শ্রীকৃষ্ণ মহাভারতের যুদ্ধের সময় এখানে স্নান করতেন। কুরুক্ষেত্র ব্রহ্মারও তপোভূমি এবং শ্রীকৃষ্ণ এখানেই অর্জুনকে গীতাজ্ঞান দান করেছেন।

সূর্যগ্রহণের সময় দেশবিদেশের লক্ষ লক্ষ ভক্ত এখানের ব্রহ্মসরোবরে স্নান করেন। হাজার হাজার সাধুসন্ত তপস্যায় মগ্ন থাকেন। বিশাল মেলা বসে যায়। কুরুক্ষেত্রের এই সূর্যগ্রহণ মেলা বিশ্ববিখ্যাত। হিসাব অনুসারে গত পাঁচ হাজার বছরে ১১ হাজার ৮০০ গ্রহণ লেগেছে, যার মধ্যে প্রায় ৪ হাজার সূর্যগ্রহণের উল্লেখ আছে। বলা হয় সূর্য গ্রহণের সময় কুরুক্ষেত্রের সরোবরে স্নান করলে মুক্তিলাভ হয়। আরো মনে করা হয়, অমাবস্যার সময় দেশের সব তীর্থস্থানের জল কুরুক্ষেত্রের সরোবরে সন্নিবিষ্ট হয়। এরকম ব্রহ্মসরোবর প্রজাপতি ব্রহ্মার নামে প্রসিদ্ধ। মহাভারতের বনপর্বে বলা হয়েছে, এই সরোবরে স্নান করলে ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করা যায়। শ্রীমদ্‌ভাগবতের দশম স্কন্ধেও মহাভারতের যুগের থেকে অনেক বছর আগের কুরুক্ষেত্রের সূর্যগ্রহণের উল্লেখ আছে। এই মেলায় অঙ্গ, বৎস, মগধ, পাঞ্চাল, কাশী, কোশলের রাজন্যবর্গ স্নান করতে আসতেন। এখনো নেপাল, ব্রহ্মদেশ, তীব্বত থেকে ভক্তরা স্নান করতে আসেন। কুরুক্ষেত্রের শ্রীকৃষ্ণ সংগ্রালয়ের উপনির্দেশক রাজেশ পুরোহিত জানান, "ভাগবত পুরাণে বর্ণনা আছে দ্বারকার দুর্গের দায়িত্ব অনিরুদ্ধ কৃতবর্মাকে অর্পণ করে শ্রীকৃষ্ণ, অক্রুর, বাসুদেব, উগ্রসেন, প্রদ্যুম্ন, শাম্ব আদি যদুবংশীয়রা তাঁদের স্ত্রী ও আত্মীয়স্বজনদের নিয়ে কুরুক্ষেত্রে সূর্যগ্রহণের মেলায় স্নানের জন্য আসতেন। ব্রজমণ্ডল থেকেও অধিক সংখ্যায় গোপ-গোপিনীরা স্নান করতে আসতেন।" কুরুক্ষেত্রের সংগ্রহালয়ে এক ছায়াচিত্রের মাধ্যমে পৌরাণিক মেলার বিষয়ে দেখানো হয়।

পৌরাণিক নগর

শ্রীশ্রীমদনগোপাল বিগ্রহ

বৃন্দাবন

গোপাল চক্রবর্তী

বরাহপুরাণে উল্লেখ আছে মথুরার দ্বাদশবনের অন্যতম বৃন্দাবন। বৃন্দা অর্থাৎ তুলসী, তুলসীর বন বলে বৃন্দাবন। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের মতে সত্য যুগের রাজা কেদারের কন্যা কমলার অংশ স্বরূপা, তপস্বিনী, যোগশাস্ত্রে বিশারদ, বৃন্দার তপস্যাক্ষেত্র ছিল বলে স্থানটির নাম বৃন্দাবন। বৃহদ্‌গৌতমীয় তন্ত্র অনুসারে বৃন্দাবনের বিস্তৃতি পঞ্চযোজন। শ্রীমদ্‌ভাগবদ্ অনুসারে যোড়শ ক্রোশ। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন, ''চৌরাশী-ক্রোশবেষ্টিত শ্রীব্রজমণ্ডল।'' আধুনিক যুগে বৃন্দাবনের পরিক্রমা ৬.৪ কিলোমিটার। রাধাকৃষ্ণের লীলাভূমি বৃন্দাবন। এখানে যমুনার তীরে রাধাকৃষ্ণের রাসলীলা হয়েছিল। রাধাকৃষ্ণের লীলাভূমির বিস্মৃতবার্তাকে শ্রীচৈতন্য পুনরায় প্রচলিত করেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর শ্রীচৈতন্য নীলাচল থেকে ঝাড়খণ্ডের শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য অতিক্রম করে মাত্র কয়েকজন সহচর নিয়ে পদব্রজে বৃন্দাবনে উপস্থিত হলেন। আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে তিনি বৃন্দাবন ভ্রমণ করেছেন। যবন শাসকদের অত্যাচারে বৃন্দাবন ছারখার। ভদ্রসমাজের বাস নেই। বৃন্দাবনের অধিকাংশ জলমগ্ন। সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে শ্রীনিমাই লোকনাথ ও ভূদেব নামে দুই অনুগামীকে বৃন্দাবনের পুনরুদ্ধারের দায়িত্ব দিয়ে বৃন্দাবনে পাঠিয়েছিলেন। তাঁরা যখন শুনলেন যে প্রভু সন্ন্যাস নিয়ে দক্ষিণে চলে গেছেন তখন তাঁরাও প্রভুর সন্ধানে বৃন্দাবন ছেড়ে চলে এলেন কিন্তু শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ হয়নি। কাজেই শ্রীচৈতন্য স্বয়ং বৃন্দাবন পুনরুদ্ধারের কাজে প্রবৃত্ত হলেন। গোবর্ধনগিরি পুনরুদ্ধার করলেন। শ্রীচৈতন্য ছুটে চলেছেন রাসস্থলীর উদ্দেশে যার দর্শনে হৃদয়ে রাস-রসের উদয় হয়, কিন্তু কোথায় রাসস্থলী? রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ডর দর্শনে ব্রজলীলার স্ফূর্তি হয় সে কুণ্ডদ্বয় কোথায় ছিল, স্থানীয়দের কেউই তার সন্ধান দিতে পারল না। অবশেষে শ্রীচৈতন্য একটি ধানক্ষেত্রের মধ্যে নেমে তাকেই শ্যামকুণ্ড এবং রাধাকুণ্ড নামে স্তব করতে লাগলেন। পরবর্তীকালে এই ধানক্ষেতই শ্যামকুণ্ড এবং রাধাকুণ্ড নামে খ্যাতি লাভ করে।

গৌড়ের রাজসরকারের কাজ থেকে অব্যাহতি নিয়ে দবির-ই-খাস ও সাকর মল্লিক শ্রীচৈতন্যের আশ্রয়ে আসেন। তাঁদের উপাধি হয় রূপ এবং সনাতন গোস্বামী। শ্রীচৈতন্য তাঁদের উপর বৃন্দাবন পুনরুদ্ধারের দায়িত্ব অর্পণ করলেন। এই ভক্তপ্রবর ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রচেষ্টায় বৃন্দাবন স্বমহিমায় সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে। যদিও খৃস্টীয় দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকের বহু গ্রন্থে বৃন্দাবনের মাহাত্ম্য ঘোষিত হয়েছিল।

বৃন্দাবনের বৈষ্ণব মন্দিরগুলির মধ্যে মদনমোহন বা মদনগোপাল, গোবিন্দ ও গোপীনাথের মন্দির সর্বপ্রাচীন। কিংবদন্তী অনুসারে রামদাস বা কৃষ্ণদাস নামে এক মুলতানি বণিক মদনমোহন মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। সুরদাসের লেখায় এই মন্দিরের উল্লেখ আছে। গোবিন্দজী মন্দিরের শিলালিপি থেকে জানা যায় ১৫৯০ খৃস্টাব্দে রাজা মানসিংহ এটি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাচীন মন্দিরগুলির মধ্যে এটি সর্বপ্রধান এবং মন্দির স্থাপত্যের অপূর্ব নিদর্শন। গোপীনাথের মন্দিরের নির্মাতা ছিলেন আকবরের সেনাপতি কাছোয়া রাজা রায়সালজী। গোবিন্দর মুখমণ্ডল, গোপীনাথের বক্ষ আর মদনমোহনের শ্রীচরণ দর্শনে গোবিন্দ দর্শনের পূর্ণতা লাভ হয়। এমনকী গোবিন্দজীউর পূজার পরে গোপীনাথ, মদনমোহন ও অন্যান্য দেবতার পূজার বিধি।

ব্রজ অর্থাৎ গোচারণ ভূমি বা গোরুর আবাসস্থল। কেশিঘাটে যুগলকিশোর মন্দিরের নির্মাণকাল সম্ভবত ১৬২৭ খৃস্টাব্দে। এর নির্মাতা নোন্‌রকরণ বা নেতাকরণ নামে এক নৃপতি। এর নাটমণ্ডপের খিলানের নীচে শ্রীকৃষ্ণের গোবর্ধন লীলা খোদিত আছে। এখানে রয়েছে ১৮৫১ খৃস্টাব্দে ৪৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সুউচ্চ গোপুরম্-সহ শেঠ গোবিন্দ দাসের তৈরি শ্রীরঙ্গনাথজী অর্থাৎ অনন্ত শয়নে শায়িত বিষ্ণুর মন্দির। মূল মন্দির চত্বরে রয়েছেন লক্ষ্মী ও ব্রহ্মার মন্দির। রয়েছেন দক্ষিণের বালাজী। রাম লক্ষ্মণ সীতা রয়েছেন রৌপ্য সিংহাসনে। আছে ধ্বজস্তম্ভ অর্থাৎ ১৬ মিটার উঁচু দেড়মন সোনার পাতে মোড়া তালগাছ। শিশমহল, জলাশয়, বাগান। এই মন্দিরের কাছেই মীরাবাঈয়ের ভজন আশ্রম। দু' হাজার অনাথ মহিলা শ্রীকৃষ্ণ ভজন করছেন সকাল সন্ধ্যা আহারের বিনিময়ে। এক সময়ে যমুনায় ৩৮টি স্নানঘাট ছিল, বর্তমানে ৫টি ছাড়া বাকিগুলি জলাভাবে শুষ্ক। এখানে রয়েছে মুক্তলতায় ছাওয়া রাধাকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র নিধুবন। এখানেই আছে সঙ্গীত সাধক স্বামী হরিদাসের সমাধিস্থল। হরিদাস জয়ন্তীতে দূরদূরান্ত থেকে আসে সুরসাধকের দল, বসে সঙ্গীতের আসর। বৈষ্ণবদের বিশ্বাস বৃন্দাবনে মৃত্যুতে মোক্ষলাভ হয়।

যত্ন করে গ্রামে লাইব্রেরি গড়েন বিষ্ণুপদ

কৌশিক গুহ

চন্দনরা বলত বিষ্ণুকাকা। গ্রামে এক পাড়াতেই বসবাস অনেক বছরের। গ্রামের চেহারা এখন বদলে গেছে। কেউ কাউকে চিনতে চায় না। যে-যার মতো থাকে। গোপালের মা বলে, 'এখন গাঁয়ের লোকের টাকা বেড়েছে আর মনটা ছোট হয়ে গেছে। কেউ কারও থেকে কম যেতে চায় না। মুরোদে কুলোক না-কুলোক লোকদেখানি চালগুলো পুরোমাত্রায় আছে।' গোপালের মায়ের ওই গাঁয়ে বিয়ে হয়েছিল আট বছর বয়সে। তারপর কতবছর কেটে গেছে। কত অদলবদল চোখে পড়ল। গ্রামে একসময় স্কুল ছিল একটাই। প্রাইমারি স্কুল। ওই পর্বের পাঠ শেষ করার পর কোথায় পড়তে যাবে তা নিয়ে ভাবনা থাকত। বিশেষ করে মেয়েদের জন্যে। কারণ হাই স্কুল অনেক দূরে। এখন সাইকেল চালিয়ে অনেক দূরে দূরে পড়তে যাচ্ছে। আগে তা ছিল না। গ্রামে অন্তত ক্লাস এইট পর্যন্ত জুনিয়ার হাই স্কুল একটা থাকা দরকার। এমন ভেবেই চেষ্টা চলল। জমি জোগাড় বাড়ি তৈরি সব চিন্তা ছিল। সুধন্বা সামন্তরা তাদের দু' বিঘে ধানজমি দিয়ে দিল স্কুল তৈরির জন্যে। রাস্তার ধারে চমৎকার জমি ছেড়ে দিল গ্রামের মঙ্গলকাজে। কোনো টাকা পয়সার লেনদেন হয়নি। সুধন্বা বলেছিল, 'গ্রামের কাজে একটা জমি দেবো তার জন্যে পয়সা নেবো কেন?' জমি দেওয়ার সঙ্গে কোনোরকম শর্ত ছিল না। যাকে বলে নিঃশর্ত সমর্পণ। জমিটা উঁচু করতে হয়েছিল মাটি ফেলে। গ্রামের লোকজন লেগে পড়ল বিনা মজুরির আনন্দ কাজে। তারপর ইঁট কেটে তা পোড়ানো। বাড়ি তৈরি হয়ে গেল। বাড়ি বাড়ি ঘুরে ছেলেমেয়েদের বলা হলো, এখন গ্রামে স্কুল হয়েছে। খুব দূরে নয়, একেবারে বাড়ির কাছে। নতুন স্কুলের নাম হলো অগ্রণী পাঠভবন।

চন্দন জানে এর আগে বিষ্ণুকাকারা গ্রামে গড়ে তুলেছে লাইব্রেরি। আশপাশের গ্রামে ওইরকম লাইব্রেরি আর নেই। গ্রামীণ গ্রন্থাগার। অগ্রণী পাঠাগার। প্রথমে ছিল ছোট মাপে আয়োজন। ছিটেবেড়ার ঘরে কিছু বই চেয়েচিন্তে এনে আর কিছু বই কিনে একটা টিনের বাকসে রেখে শুরু হয়েছিল লাইব্রেরি। ওখানে ছিল নাইট ক্লাস। গ্রামের যেসব বয়স্ক মানুষ লিখতে পড়তে শেখেননি তাঁদের ডাক দেওয়া হলো— 'এসো, পড়বে এসো। লিখতে পড়তে শেখো।' গ্রামের শ্রীপতি সাঁতরা, প্রসাদ সাউ, সুধন্বা সামন্ত এগিয়ে এলেন। পাশের গ্রামের ভানুলাল ভট্টাচার্য এক প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক, তিনি সহযোগিতা করতে রাজি হোলেন। বাড়ি বাড়ি বই পৌঁছে দেওয়া হতে লাগল। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন আরও অনেকে। বিষ্ণুপদ দে সকলকে ডাক দিলেন। সাড়া মিলল। তিনি হাওড়া শহরে এক নামী প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। সপ্তাহের শেষে বাড়ি আসেন। লাইব্রেরির কাজ করেন। সাধ্যমত খরচ করেন সানন্দে। বলেছেন, 'তাস, ক্যারাম খেলা চলবে না। পরনিন্দা, পরচর্চা নয়। বই দেবে নেবে। আর পড়াবে নিরক্ষরদের।'

কালীপদ দে গ্রামের শ্রদ্ধেয় মানুষ। পেশায় ডাক্তার। গ্রামে পাশকরা ডাক্তার নেই। তিনিই ছুটে গেছেন বাড়ি বাড়ি। লাইব্রেরিতে যোগ দিলেন প্রভঞ্জনপ্রসাদ দে। কালীপদর বড় ছেলে। লাইব্রেরি ঠিকভাবে গড়ে তোলার জন্যে উঠে পড়ে লাগলেন বিষ্ণুপদ। দৌড়ঝাঁপ করতে লাগলেন বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে। ব্লক মহকুমা এবং জেলা স্তরে। প্রবল উৎসাহী মানুষটির আন্তরিকতায় সাড়া দিলেন সরকারি কর্মীরা। জেলা সমাজশিক্ষা আধিকারিক মন্মথনাথ রায় পূর্ণ সহযোগিতা করলেন। গ্রামে জমি পাওয়া গেল ভগবতী সাউ-এর কাছে। গ্রামের মানুষ বাড়ি গড়ে তুলতে এগিয়ে এলো। লাইব্রেরির ভবন যেদিন সকলের জন্যে খুলে দেওয়া হলো সেদিন গ্রাম জুড়ে উৎসবের চেহারা। গ্রামের মানুষ প্রথম পেয়েছে ওইরকম লাইব্রেরি। বিষ্ণুপদ সব দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করলেন। ছোটবড়ো সকলেই খুশি। এত পরিশ্রম সার্থক রূপ নিয়েছে।

চন্দন আরও নানান ভূমিকায় দেখেছে বিষ্ণুকাকাকে। ধুতির উপর সাদা পুরোহাতা বাংলা শার্ট চটিপরা রোগা চেহারার মানুষ। কিন্তু মনের জোর যথেষ্ট। তাঁর চোখে স্বপ্ন। বিষ্ণুকাকা মারা গেছেন অনেক বছর হলো। পঁচিশ বছর। হিসেব করল চন্দন। তাঁর জন্মশতবর্ষ এবছর। ১৯১৫ সালে ৯ মে জন্ম। গ্রামের অনেকে তাঁর কথা ভুলে গেলেও কেউ কেউ মনে রেখেছে। চন্দনরা সিদ্ধান্ত নিলো একেবারে অনাড়ম্বর ভাবে বিষ্ণুকাকার শতবর্ষ পালনের। যাদের বলল তারা প্রত্যেকে রাজি। প্রভঞ্জনপ্রসাদ প্রথম জীবনে গ্রামের লাইব্রেরিতে কাজ শুরু করেন। পরে বাইরে কাজ করেছেন দায়িত্ব নিয়ে। তিনি বললেন চন্দনকে, 'কাকাবাবুর জন্মশতবর্ষ আমাদের নিজেদের গরজেই পালন করা দরকার।'

ছবি : রমাপ্রসাদ দত্ত

বই কথা কই

সুদত্তা বইকে বন্ধু করেছে

'বাড়ির বইগুলো ঠিমতো গুছিয়ে না রাখলে তা নষ্ট হয়ে যাবে। প্রয়োজনে খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে। প্রতিটি বই যত্ন চায়। হয়তো সব বই দরকার হবে না সবসময়। তাবলে সেগুলো অপ্রয়োজনীয় নয়। আমাদের দেশের অনেক বাড়িতেই বড়োরা ঠিক করতে পারেন না কোন জিনিসটা কতটা দরকারি। অনেক অদরকারি জিনিসেরও মূল্য থাকে। গতদিনের স্মৃতিজড়ানো জিনিসগুলো কেউ যত্নে রাখতে চায়। কেউ আবর্জনা ভেবে বিদায় করতে তৎপর হয়ে ওঠে। ওইভাবে চলে যায় কত তথ্যসামগ্রী। যার মধ্যে মিলে যেতে পারে ইতিহাসের উপাদান। একটু একটু করে জুড়েই তো সমগ্র চিত্র রচনা সম্ভব। ছবি চিঠিপত্র বই খাতা আরও কতকিছু থাকে। এক ধরনের মনোভাব অনেকের মধ্যে বাড়ে— 'সব ওজনদরে বেচে দাও। ঝেঁটিয়ে বিদেয় করো।' কাজটা খুব সহজ। যা একটু একটু করে গড়ে উঠেছিল তাকে বিদায় জানাতে দেরি হয় না। এরফলে হারিয়ে যায় অনেক কিছুই। প্রত্যেক বাড়িতেই স্মৃতিজড়ানো কিছু কিছু জিনিস থাকে। সেগুলো যত্নে রাখার জন্যে সুরুচি সুশিক্ষা দরকার। অনেকেরই তা থাকে না বলে সমস্যা। বেশির ভাগ বাড়িতেই কয়েকজন থাকে যারা বেচে খাওয়ার পক্ষপাতী। খুব যে টাকা পয়সার টানাটানি তা নয়। ওটা অভ্যেসে দাঁড়িয়ে যায়। ওই ধরনের লোকজন যে বাড়িতে থাকে তাকে লক্ষ্মীছাড়ার বাড়ি বলে। লক্ষ্মীছাড়া বলাটা ভুল তারা হলো ইতিহাস ধ্বংসকারী।'

লেখাটা সুদত্তা পড়ল। তার দাদুর ডায়েরিতে লেখা আছে। দাদুকে দেখেনি সে। তার বাবা খুব যত্নে ডায়েরিটা রেখেছিল। দাদুর হাতের লেখা ছিল বেশ স্পষ্ট। পড়তে একটু অসুবিধে হয় না। সুদত্তা একসময় নিজে পড়তে পারত না। ডায়েরির মধ্যে দাদুর একটা ফোটোগ্রাফ রেখে দিয়েছে সুদত্তার বাবা। শেষ বয়সের ছবি। দাদুর ছবি ওদের বাড়িতে বাঁধানো আছে। দাদুর হাতের লেখা আর ভাবনার সঙ্গে ফোটোগ্রাফ মিলিয়ে নেয়। শুধু ফোটোগ্রাফ থাকলে দাদুকে অতটা চেনা যেত না। লেখা পড়তে পড়তে মনে হয়, না-দেখা মানুষটি যেন সামনে এসে বসে ঠোঁট চেপে হাসছেন। তাকিয়ে আছেন নাতনির দিকে। সুদত্তার মন যেন বলতে চায়, 'তোমাকে আমি চিনি। আপনজন তুমি।' দাদু হেসে চলে যায়। দাদুর লেখার মধ্যে শব্দে সাজানো অনেক ছবি আছে। সুদত্তার কল্পনার মধ্যে সেগুলো আসা যাওয়া করে। ডায়েরিটা খুব যত্নে রাখে অমিত, সুদত্তার বাবা। দাদুর নাম লেখা অনেক বই রয়েছে বাড়িতে। বাবাকে বলল দুদত্তা, 'দাদুর বইগুলো আজ গুছিয়ে ফেলি দুজনে।' অমিত হাসল মেয়ের প্রস্তাব শুনে। একটু বাদে দুজনেই বই গোছানোর কাজে মেতে উঠল।

বইমিত্র

জল চাই জীবনের জন্যে

এক আদর্শ জননী— বিদুলা

শতভিষা সরকার

ভারতীয় পরিবারতন্ত্রের কেন্দ্রবিন্দু মা। তাই আমাদের দৃষ্টিতে প্রতিটি পরিবার মাতৃতান্ত্রিক। ভারতীয় সমাজ মাতৃত্বের মাধ্যমে নারীত্বকে দেবীত্বে উন্নীত করেছে— 'যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।' আমাদের ভারতীয় নারীরা— মায়েরা অনায়াসে এই গুরুদায়িত্ব আবহমানকাল বহন করে চলেছে, তার উদাহরণ আমাদের মায়ের জীবনেই বিদ্যমান। কত নিরলস ও নিষ্কামভাবে তাঁরা সমস্ত ঝড়-ঝাপটা উপেক্ষা করে আমাদের সংসার বৈতরণী পার করে দিচ্ছেন।

আজ এমন এক মায়ের কথা বারবার মনে পড়ছে, যিনি জগতের সমস্ত বাধা উপেক্ষা করে আপন পুত্রকে পরাজয়ের ভয়ঙ্করী বৈতরণী পার করে বিজয়ের কূলে স্থাপন করেছিলেন। তিনি মহাভারতের বিদুলা— এক বিরল জননী। আজ তাঁর কথা বারংবার মনে পড়ছে কেন? আমাদের সমাজে বর্তমানে যে যুদ্ধ চলছে, তা নিছক দেশ দখলের যুদ্ধ নয়; তা সংস্কৃতি-সভ্যতা-সমাজ ধ্বংস করে দেওয়ার যুদ্ধ। তা মানব মস্তিষ্ক দখলের, অস্তিত্ব দখলের যুদ্ধ। ভারতীয় সমাজ সংস্কৃতিকে শত্রুরা চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে। অহরহ আক্রমণ করছে। আমরা বিদুলাপুত্র সঞ্জয়ের মতো ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ঘরে বসে কান্না জুড়ে দিয়েছি। 'গেল-গেল' রব তুলেছি।

বিদুলার কাহিনীটি আজকের পটভূমিকায় তাৎপর্য আছে কিনা পাঠকই বিচার করবেন। বিদুলা রাজমাতা, এক তেজস্বিনী ক্ষত্রিয়া নারী। শাশ্বত বংশে তাঁর জন্ম, সৌবীররাজের স্ত্রী তিনি। সিন্ধুদেশের পূর্বদিকে সৌবীর দেশ। বিদুলার স্বামী সৌবীররাজের মৃত্যুর পর পুত্র সঞ্জয় রাজা হন। তিনি দুর্বল প্রকৃতির জেনে সিন্ধুরাজ সৌবীর দেশ দখল করেন। পরাজিত সঞ্জয় ভগ্নহৃদয়ে রাজধানীতে ফিরে এসে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শুয়ে কাঁদতে লাগলেন। এমন কাপুরুষ পুত্রের প্রতি বিদুলার বিন্দুমাত্র সহানুভূতি ছিল না। এখানেই বিদুলার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। আর এই জন্যই তিনি আজও আদর্শ জননী। বিদুলা যথার্থ ক্ষত্রিয় নারী। যে ক্ষাত্রধর্ম কখনও কারও বশ্যতা স্বীকার করে না— শুধু সংগ্রাম করেই চলে— তিনি তার মূর্ত প্রতীক, শাশ্বত উদাহরণ। বিদুলা রাজমাতা, সর্বোপরি ভারতীয় মা। কিন্তু তাঁর সাধারণ নারীসুলভ অন্ধ-মাতৃস্নেহ ছিল না। তা ছিল একজন রাজ্যশাসক রাজপুত্রের প্রতি এক বীরাঙ্গনা রাজমাতার মাতৃস্নেহ। তাই পরাজিত, ক্রন্দনরত, ভীরু পুত্রের প্রতি তাঁর উপদেশ— 'ওহে আমার অপদার্থ পুত্র! মনে হয় তুমি আমার বা আমার স্বামীর পুত্র নও। ওহে ভীরু ওঠো, জাগো, শুয়ে শুয়ে পরাজয় মেনে নিয়ো না। অসহায় কুকুরের মতো মৃত্যু অপেক্ষা, সাপের মণি আনতে গিয়ে মৃত্যুবরণ শ্রেয়। জীবনকে বিপন্ন করে বীরের মতো যুদ্ধ চালিয়ে যাও। চিরকাল ধূম উদ্‌গীরণ করার চেয়ে ক্ষণকালের জন্য জ্বলে ওঠা শ্রেয়।'

এমন তীব্র ভর্ৎসনা-বাক্য শুনেও সঞ্জয় যুদ্ধে যেতে চাইলেন না। তিনি মাতৃহৃদয়ে আঘাত দিয়ে বললেন, 'মা, তোমার আমোদ-প্রমোদ, অলঙ্কার-ঐশ্বর্য, জীবন-যৌবনের কী সার্থকতা থাকবে, যদি তোমার পুত্র যুদ্ধে মারা যায়?' পুত্রের মুখে একথা শুনেও বিদুলা দমলেন না। তিনি দক্ষ চিকিৎসকের মতো স্বল্প অস্ত্রোপচারে জীবননাশী ব্যাধি থেকে পুত্রকে রক্ষা করার জন্য বললেন, 'নিজ বলের উপর নির্ভর করে মহৎ জীবন যাপনের উপর যথা-কীর্তি নির্ভর করে। 'তোমার নাম সঞ্জয়, যার অর্থ বিজেতা— তোমার মধ্যে সে নামের কোনো সার্থকতা দেখি না। তুমি যুদ্ধে শত্রুদের পরাস্ত করে তোমার রাজধর্ম পালন করো। তুমি কি পরাজিতের ন্যায় সিন্ধুরাজকন্যাদের দাসত্ব করবে?' মানব চরিত্রে ও মনোবিজ্ঞানে পারদর্শিনী বিদুলার এই ভর্ৎসনাবাক্যে সঞ্জয় উঠে দাঁড়ালেন। সে কিনা এমন পুরুষ যে সিন্ধুরাজকন্যাদের দাসত্ব করবে? মাতৃকুলে অনন্য এক জননী বিদুলা জানতেন, তাঁর পুত্রকে এখনই উত্তেজিত করতে না পারলে ভবিষ্যতে আর কখনও যুদ্ধে পাঠানো যাবে না। তিনিই আদর্শ মা, যিনি পুত্রের মুখে আমোদ-প্রমোদ, ঐশ্বর্য-অলঙ্কার, জীবনযৌবন উপভোগের খোঁচা খেয়েও আপন লক্ষ্যে অবিচল থেকে পুত্রকে ভীরুতা, আলস্য, অপযশ থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করছেন। বিদুলা বললেন, 'আমাদের পূর্বপুরুষদের সঞ্চিত গুপ্তধন আছে, আমি তোমাকে সেইসব ধনসম্পদ দেবো। তোমাকে সৈন্য সংগ্রহ করে দেবো। তুমি শুধু যুদ্ধ করো।' তিনি সঞ্জয়কে আত্মমর্যাদা স্মরণ করিয়ে দিলেন। সঞ্জয় ধীরে ধীরে উৎসাহ অর্জন করলেন। অবশেষে সঞ্জয় যুদ্ধে জয়লাভ করে হৃতরাজ্য উদ্ধার করলেন।

অনেকেই হয়তো ভাবছেন, এই মহীয়সী নারী কেন নিজের হাতে রাজ্যভার গ্রহণ করলেন না? কেনই বা অপদার্থ পুত্রের উপর নির্ভর করলেন? এইসব প্রশ্নের একটিই উত্তর— স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সম্রাজ্ঞী বিদুলার মৃত্যু হয়। যে বিদুলা জীবিতা ছিলেন, তিনি জননী বিদুলা। তাঁর মাতৃহৃদয়ের একামাত্র চিন্তা পুত্রের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ।

আমাদের সমাজে অহরহ যে যুদ্ধ চলছে, পাশ্চাত্য ভোগবাদী সভ্যতার সঙ্গে ভারতীয় ত্যাগবাদী সভ্যতার যুদ্ধ। সে যুদ্ধে পরাজয়ের অর্থ আমাদের সভ্যতার বিনাশ। সুতরাং যে ভাবেই হোক, যত কষ্টেই হোক, এই সংস্কৃতির অস্তিত্ব রক্ষা করতে হবে। তাই আজ বিদুলার মতো মায়েদের প্রয়োজন। যাঁরা ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি রক্ষার যুদ্ধে আপন সন্তানকে জয়লাভের প্রেরণা দেবেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এ যুগেও বিদুলার মতো মায়েরাই ভারতীয় সভ্যতাকে রক্ষা করবেন এবং ভারতীয় সমাজ মায়েদের উপর যে গুরুদায়িত্ব দিয়েছে অনায়াসেই তাঁরা সে দায়িত্ব পালন করে মাতৃত্বকে অনন্ত মহিমায় স্থাপন করবেন।

অতিথি কলম

মুজফ্‌ফর হোসেন

সীমান্তের ওপারেও মোদী লহর

পাঠক নিশ্চয় ভুলে যাননি এক বছর আগে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজাপারভেজ ভারতে এসেছিলেন। যদিও তাঁর ভারতে আসার উদ্দেশ্য ছিল আজমিরে খাজা মৈনুদ্দিন চিস্তির দরগায় চাদর চড়ানো, কিন্তু তিনি দিল্লী যেতে ভুল করেননি। কেননা তাঁর একটা গুপ্ত এজেন্ডা ছিল, যার কারণে তিনি প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-এর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে তিনি বলতে চেয়েছিলেন যে, পাকিস্তানকে কচ্ছ উপকূলে 'সরক্রীক'-এর পুরোটাই সমর্পণ করতে হবে। দেশভাগের সময় পাকিস্তান কেবল তার ১০ ভাগ পেয়েছিল। তাঁর দাবি বাকি ৯০ ভাগ তাদেরকে দিতে হবে। পাকিস্তান সরকারের নীতি হলো, ভারতের সীমানার কোনো না কোনো এলাকা দখল করা অথবা ভারতীয় নেতাদের কোনো না কোনো ভাবে বিশ্বাস অর্জন করে সেই অংশ দখল করা। পাকিস্তান ও বাংলাদেশ তৈরি হওয়ার পর এরকমই হয়ে আসছে। নরেন্দ্র মোদী এসব খবর

> **পাকিস্তানের ক্ষমতাসীনরা যদি আর কাউকে ভয় পেয়ে থাকে তবে তিনি শুধুই নরেন্দ্র মোদী। মোদী তাদের ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ। তিনি কুশল প্রশাসক ও নির্ভীক হৃদয়ের মানুষ, এজন্য পাকিস্তানি নেতাদের অনৈতিক দাবি মেনে নেওয়ার ব্যক্তি তিনি নন।**

অনেক আগে থেকেই রাখতেন। তিনি এটা অনুমান করেছিলেন যে, রাজা পারভেজ ভারত সরকারকে কবজা করার চেষ্টা করবেন। এজন্য মোদী তড়িঘড়ি বিমানে দিল্লী এসে মনমোহন সিংকে সাবধান করে দিয়েছিলেন। রাজা পারভেজ যখন নরেন্দ্র মোদীর দিল্লী আসার খবর পেয়ে যান সঙ্গে সঙ্গেই পাকিস্তান অভিমুখে যাত্রা করেন।

রাজা পারভেজ ও মনমোহন সিং দুজনেই বুঝতে পারেন যে বিষয়টা বিগড়ে গেল। রাজা আজমিরে চাদর চড়ানোর অছিলায় এসেছিলেন, এজন্য আজমির থেকেই খালি হাতে ফিরে গেলেন। তাঁর আসল উদ্দেশ্য পূর্ণ হলো না। যদি নরেন্দ্র মোদী ঠিক সময়ে দিল্লী না পৌঁছতেন তাহলে ভারতের একটি অংশ আবার পাকিস্তানকে দিয়ে দেওয়া হোত। এই খবর দুই দেশের সমাচারপত্রে খোলাখুলি ভাবে ছাপা হয়েছিল। এই স্তম্ভলেখকও পাকিস্তান বিষয়ে 'ডেসপ্যাচ'-এ তার বর্ণনা করেছিল। কিন্তু দেশের খুব কম লোকেরই মনোযোগ এই বিষয়ের ওপর ছিল। 'সরক্রীক' হাতে না আসায় পাকিস্তানের প্রশাসকরা খুবই হতাশ হয়েছিলেন। এজন্য যখন এবার এই ভোটে জিতে নরেন্দ্র মোদীর প্রধানমন্ত্রী হওয়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তখন পাকিস্তান নরেন্দ্র মোদী ও বিজেপি-র জয়কে কীভাবে হজম করবে সেটাই দেখার বিষয়।

ভারতে নরেন্দ্র মোদীর প্রভাব পাকিস্তান খুব ভালো করেই জানে। এজন্য সেখানে তার বিরোধিতা করা কোনো অবাক হওয়ার কথা নয়। পাকিস্তানে মোদীর যে বিরোধিতা করা হচ্ছে তাতে তাদের ভয়ই প্রকাশ পাচ্ছে। যদি বিজেপি নরেন্দ্র মোদীকে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী না ঘোষণা করতো এবং তাঁর জয়ের সম্ভাবনা নিয়ে বিশ্বের প্রচারমাধ্যম এত সরব না হতো তাহলে পাকিস্তানি সংবাদপত্রেও এত বিরোধিতা হতো না। ভোটে বিজেপি আগেও লড়েছে এবং অটলবিহারী বাজপেয়ীর মতো দূরদর্শী ও দেশভক্ত ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন হয়েছিলেন। পাকিস্তানি সংবাদপত্র ভারতের বর্তমান নির্বাচন নিয়ে অনেক কিছু ছাপাছাপি করছে। ভারতীয় জনতা পার্টির বিরোধিতা আগেও ছিল, কিন্তু এত ছিল না যা এখন ইসলামাবাদ করছে। ইন্দিরা গান্ধীর মতোই নরেন্দ্র মোদীর জন্যও পাকিস্তান ভয়ে কুঁকড়ে আছে— এটা ভারতের পক্ষে বিশেষ গর্বের কথা। গুজরাট দাঙ্গায় পাকিস্তানের কোনো লেনাদেন ছিল না, কিন্তু ভবিষ্যতে পাকিস্তানের যে কঠিন দিন আসছে তাতে তারা খুবই চিন্তিত।

পাকিস্তানের প্রচারমাধ্যমের সমস্ত বিভাগ নরেন্দ্র মোদীর বিরোধিতায় মুখর। এদের মধ্যে প্রিন্টমিডিয়া এক নম্বরে। পাকিস্তানের উর্দু ও ইংরেজি কাগজগুলিই শুধু নয়, সিন্ধি, পাঞ্জাবি ও পুস্ত ভাষায় প্রকাশিত খবরের কাগজগুলিরও সিংহভাগ ভারতের নির্বাচন বিশ্লেষণ নিয়েই ভর্তি। একটি কথা খুবই পরিষ্কার যে, ইন্দিরা গান্ধীর পর পাকিস্তানের ক্ষমতাসীনরা যদি আর কাউকে ভয় পেয়ে থাকে তবে তিনি শুধুই নরেন্দ্র মোদী। মোদী তাদের ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ। তিনি কুশল প্রশাসক ও নির্ভীক হৃদয়ের মানুষ, এজন্য পাকিস্তানি নেতাদের

অনৈতিক দাবি মেনে নেওয়ার ব্যক্তি তিনি নন। ২০০২ সালের দাঙ্গা ও মুসলমানদের উল্টাপাল্টা বয়ানে তিনি ভয়ভীত নন ও তোষামোদে গলে যাবার মানুষও নন। 'দৈনিক ডন' পত্রিকা কয়েকদিন আগে একটি বিশ্লেষণে লিখেছে নরেন্দ্রমোদী নিরঙ্কুশ ক্ষমতায় সরকার গড়বেন।

এক সময় পাকিস্তান শুধুমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টির বিরোধিতা করতো। কিন্তু এ সময় তারা শুধু নরেন্দ্র মোদীর বিরোধিতাতেই উঠে পড়ে লেগেছে। করাচী থেকে প্রকাশিত 'দৈনিক এক্সপ্রেস' লিখেছে, ভারতের এই নির্বাচনে যদি স্পষ্ট কথা বলার কেউ থাকেন তো তিনি নরেন্দ্র মোদী। মোদী সরকার তার কার্যকাল পূর্ণ করবে। ভারতীয় জনতা পার্টিকে অন্যান্য দলও সমর্থন করছে। ভারতীয় গণতন্ত্রে এমন সময় এসেছে যে, কংগ্রেস ও ভারতীয় জনতা পার্টি নিরঙ্কুশ ক্ষমতা পায়নি, তবু তাদের সরকার চলেছে। সেই তুলনায় বিজেপি-র অবস্থা এবার অনেক ভালো। তারা ২৫৫ থেকে ২৮০টি আসন পাবেই।" পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যমের মতে, অনেকবার অকংগ্রেসী দল নিরঙ্কুশ ক্ষমতা না পেয়েও জোট সরকারের মাধ্যমে তাদের কার্যকাল পূর্ণ করেছে।

'দৈনিক ডন' লিখেছে, মুসলমানরা নরেন্দ্র মোদীর প্রধানমন্ত্রী হওয়া নিয়ে আতঙ্কিত। কিন্তু তাঁর সমর্থনে ভালো মানুষরা পাশে দাঁড়িয়েছেন। বিজেপি তাদের ঘোষণাপত্রে সমান নাগরিক অধিকার আইন ও রামমন্দির নির্মাণের মতো বিষয় রেখেছে। কিন্তু সার্বজনিকভাবে তার কোনো বিরোধিতা চোখে পড়েনি। এরকম মনে হচ্ছে যে, এবার তারা ক্ষমতায় আসার জন্য কোনোরকম আপোস করবেন না। ১৯৭৭ সালে জনতা পার্টিতে জনসঙ্ঘের (বিজেপি-র পুরনো স্বরূপ) অস্তিত্ব বিলয় করতে হয়েছিল, কিন্তু এবার এরকম কিছু হবে না। এখন পর্যন্ত রাজ্যস্তরের অনেক দল বিজেপিতে বিলয় হয়েছে অথবা আসন ভাগাভাগি করে নিয়েছে। ভারত রাজনীতি সচেতন দেশ, এজন্য রাজনৈতিক দলগুলির আর শিশুসুলভ ভাব দেখা যাচ্ছে না।

ডন একটি লেখায় প্রশ্ন তুলেছে, "মোটামুটিভাবে কোনো অস্থির দেশে মুসলমান, হিন্দু, শিখ অথবা খৃস্টান কেউই আনন্দে থাকতে পারে না। তা পাকিস্তানি সাংবাদিকদের নিজের দেশের মুসলমানদের ছেড়ে ভারতের মুসলমানদের নিয়ে এত চিন্তা কেন? পাকিস্তানের মুসলমানরা প্রতিবেশী দেশের মুসলমানদের চেয়ে ভালো আছে এটা যদি সত্যি হয় তবে পাকিস্তানি সাংবাদিকতার মান কত নিম্নস্তরের তা বুঝতে কষ্ট হয় না। এরকম ভাবনার জন্য আমাদের সাংবাদিকরা দায়ী নন, দায়ী পাকিস্তানি সরকার। পাকিস্তানে মুসলমানদের জীবনস্তরের যে পতন হয়েছে তার জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী পাকিস্তানের সরকার। আমরা যদি ভারতকে দিনরাত গালিগালাজ করি তবে কি আমাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যাবে? কোনো গণতান্ত্রিক দেশে সরকার ও ভোটদাতা দুই-ই দায়ী থাকে। এজন্য সরকারের সমালোচনা করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে না। পাকিস্তানের প্রচারমাধ্যমকে সরকার ও জনতা দুটোকেই সংশোধন করতে হবে। ভারতের নেতারা চিৎকার তো করেন, কিন্তু বাজেটের মাধ্যমে দেশের লোকের জীবনস্তর উন্নত করার চেষ্টাও করেন। কেননা পাঁচ বছর পর আবার তাঁদের মানুষের কাছেই আসতে হবে। কিন্তু পাকিস্তানের নেতারা এ বিষয়ে খুবই উদাসীন। তাঁরা দোষ শুধু সরকারের ওপর দিয়ে থাকেন। তাঁরা ভাবেন না এজন্য সরকারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরাও সমানভাবে দায়ী। ভাবেন না গণতন্ত্রের গাড়ি নেতা ও জনতা দুই চাকার ওপরই চলে। পাকিস্তানে জনতা ও নেতা দুই শ্রেণীই উদাসীন। এজন্য আমাদের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে শক্ত করতে হবে। পাকিস্তানের নেতা যদি মিলিটারি শাসনের ভাষা বোঝে তো জনতাও গোলামি করার জন্য তৈরি থাকে। এটা আমাদের সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের ব্যাপার। ভারতের মুসলমানরা চোখ বন্ধ করে ভোট দেয়, এই অবস্থান এখন পুরনো হয়ে গেছে।"

তবু সোনিয়া গান্ধী ইমামের কাছে নতমস্তক হচ্ছেন। মুষ্টিমেয় মুসলমানের এতে লাভ হচ্ছে আর সাধারণ মুসলমান সেই অন্ধকার গলিতেই পড়ে আছে। এর জন্য যত দোষ কংগ্রেস নেতাদের তত দোষ মুসলমান নেতা ও মোল্লা-মৌলভীদের। আজও ভারতের মুসলমানরা তাদের ভোট মজহবের ঘেরাটোপে বন্দী করে রেখেছে। এজন্য সরকার ও রাজনৈতিক দল কি করবে? আসল দোষ তো ওই মুসলমান নেতাদের যারা নিজেদের স্বার্থে তাদের বাইরের আলো দেখতে দিচ্ছে না। এই ইমামদের কারণেই জরুরি অবস্থার সময় ওখানকার মুসলমানদের অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। সোনিয়া গান্ধী তাদের ভুলপথে নিয়ে যাচ্ছে আর ইমাম মুসলমানদের নিজের স্বার্থে রাস্তায় নামিয়ে দিচ্ছে। এতে অন্য দলগুলি কি করবে? মজহবের নামে কতদিন এই 'ব্ল্যাকমেল' চলবে?

কংগ্রেসে সংখ্যালঘুদের নিয়ে রাজনীতি রাজীব গান্ধীর সময় থেকে শুরু হয়েছে। প্রথমে মোহম্মদ আরিফ খানের সঙ্গে বিরোধিতা ও পরে পার্সনাল ল'-এর নামে 'ব্ল্যাকমেল' করা। এরকম সুবিধাবাদী সব জায়গায় আছে। পাকিস্তানে ইসলামের নামে কি কি না হয়? সত্যি কথা হলো মজহবের নামে রাজনীতি হয় না। কিন্তু মুসলমানরা তো পুরো মজহবকেই রাজনীতি করে ছেড়েছে। বাস্তবিকপক্ষে সম্পূর্ণ ভূখণ্ডে স্বার্থন্বেষী মুসলমান নেতা ও মোল্লা-মৌলভীরা মুসলমানদের ব্ল্যাকমেল করে চলেছে। ইসলামের সত্যিকারের সেবক তো তারাই যারা ওই নেতা ও মোল্লা-মৌলভীদের কথামতো চলে।

রাষ্ট্রের দ্বারা যদি মুসলমানদের ভালো হয় তবে তাকে স্বাগত জানানো উচিত। পাকিস্তানের উর্দুপ্রেস একথা স্বীকার করে যে ভারতের মুসলমানদের চেতনা জাগ্রত হচ্ছে। পাকিস্তানের মুসলমানদের স্থিতি খুবই খারাপ অবস্থায় আছে। গণতন্ত্র তো আশীর্বাদ স্বরূপ, কিন্তু তাকে মজহবের ঘেরাটোপে বন্দী করে অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন তোলা ঠিক নয়। ভারতের মুসলমানের জন্য চোখের জল ফেলে অথবা তাদের রক্ষার নামে আন্দোলন করে কোনো ভালো কাজ হচ্ছে না। তাদের চিন্তা করা ছেড়ে দাও, সেটাই হবে মুসলমানদের প্রতি সবচেয়ে বড় কৃপা।

কে হবেন প্রধানমন্ত্রী

ড. নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত

সারা দেশেই এখন একটা প্রশ্ন উঠে পড়েছে— এবার কে প্রধানমন্ত্রী হবেন। প্রধান দুটো পক্ষের মধ্যে এনডিএ জানিয়ে দিয়েছে— তার তরফে প্রার্থী নরেন্দ্র মোদী। কিন্তু অপরপক্ষ— অর্থাৎ কংগ্রেস এই বিষয়ে কিছু জানায়নি। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং একবার বলেছেন, রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে তাঁর কাজ করার ব্যাপারে কোনও আপত্তি নেই। তিনি আবার সেই সঙ্গে জানিয়েছেন, দল বললে তিনি ওই পদে আবার বসতে রাজি। আর সবাই জানেন, এই ব্যাপারে সোনিয়া গান্ধীরও আগ্রহ আছে।

কিন্তু এই ক্ষেত্রে আসল ব্যাপারটা নির্ভর করছে কিছু সাংবিধানিক শর্ত ও দলীয় অবস্থার ওপর।

যদি প্রশ্ন করা হয়— রাষ্ট্রপতি এই পদে কাকে মনোনীত করবেন, তাহলে অনেকেই উত্তরে বলেন— সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা/ নেত্রীকেই মনোনীত করা হয়।

কিন্তু এটা স্পষ্ট কোনও উত্তর নয়। কারণ এতে স্পষ্ট নয় কোন কক্ষ থেকে প্রধানন্ত্রীকে মনোনীত করা হতে পারে। তাছাড়া কোনো দলই নিরঙ্কুশ বা একক গরিষ্ঠতা না পেতে পারে। এই কারণেই প্রথমে দেখতে হবে--- এই ব্যাপারে সংবিধানিক ব্যবস্থাটা কি?

আমাদের সংবিধানের ৭৫ (১) নং অনুচ্ছেদে আছে— 'The Prme Minister shall be appointed by the President and the other Ministers shall be appointed by the President on the advice of the Prime Minister।' স্পষ্টতই এই অনুচ্ছেদে দুটো অংশ আছে। দ্বিতীয় অংশে বলা হয়েছে— অন্যান্য মন্ত্রীকে রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করবেন প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারেই। অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি নিয়োগকর্তা হলেও পছন্দটা প্রধানমন্ত্রীর। নিয়োগের ক্ষেত্রে ৭৫ (১) নং অনুচ্ছেদ কোনো শর্তই আরোপ করেনি।

কিন্তু দুটো শর্ত রয়েছে ৭৫ (৩) ও ১৭৫ (৫) নং অনুচ্ছেদে। প্রথমত, ক্যাবিনেটের লোকসভার আস্থাভাজন হতেই হবে— লোকসভায় পরাজিত হলে প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর ক্যাবিনেট ক্ষমতায় থাকতে পারে না। দ্বিতীয়ত, মন্ত্রীদের সংসদের সদস্য হতেই হবে। মন্ত্রী হওয়ার সময় কেউ যদি সদস্য না হন, পরবর্তী ছয় মাসের মধ্যে তাঁকে রাজ্যসভা বা লোকসভার সদস্যপদ অর্জন করতেই হবে।

> তবে এরই মধ্যে বলা যায়— নরেন্দ্র মোদীর সম্ভাবনাই বেশি। তার কারণ হলো— বিজেপি ইতিমধ্যেই তাঁর নামটা প্রায় সারা দেশে তুলে ধরতে পেরেছে। দ্বিতীয়ত, বেশ কয়েকটা সংস্থা প্রাক্-নির্বাচনী সমীক্ষায় জানিয়েছে যে, বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ গরিষ্ঠতা পেতে পারে। তৃতীয়ত, বিজেপি তার নমনীয়তার কারণে তার ভিতটা বিস্তৃত করতে পেরেছে— এনডিএ সম্প্রসারিত হয়েছে ডি এম ডি কে, আর পি এম কে, পি ডি পি ইত্যাদি আসার ফলে।

সেই কারণে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে রাষ্ট্রপতি সাধারণত এমন একজনকে বেছে নেন যাঁর পেছনে লোকসভার গরিষ্ঠের সমর্থন রয়েছে। আর এক্ষেত্রে লোকসভাকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। ইন্দিরা গান্ধী প্রথমবার (১৯৬৬) প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন রাজ্যসভা থেকে— কিন্তু পরের দুবার (১৯৭৭ ও ১৯৮০) তিনিও ছিলেন লোকসভার সদস্যা। তাঁর আগে নেহরু ও লালবাহাদুর শাস্ত্রী এবং পরে রাজীব গান্ধী (দ্বিতীয়বার), ভি পি সিং, চন্দ্রশেখর, অটলবিহারী বাজপেয়ী ও নরসীমা রাও ছিলেন লোকসভার প্রতিনিধি। তবে দেবেগৌড়া ছিলেন সংসদের বাইরের মানুষ। আর পুরনো প্রথা ভেঙে মনমোহন সিং দুবার প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন রাজ্যসভা থেকে। সুতরাং বলা চলে, প্রধানমন্ত্রী কিন্তু লোকসভা, রাজ্যসভা— এমনকী বাইরের মানুষও হতে পারেন।

দ্বিতীয় ব্যাপারটা গরিষ্ঠাতা নিয়ে। সংবিধান কখনও বলেনি যে, গরিষ্ঠতার প্রমাণ নিয়ে তবেই রাষ্ট্রপতি তাঁর প্রধানমন্ত্রীকে নিযুক্ত করবেন। প্রধানমন্ত্রী আসলে লোকসভার গরিষ্ঠ দলের নেতা বা নেত্রী হতে পারেন, একটা গোষ্ঠীর প্রধান হতে পারেন, ক্ষুদ্র দলের নেতা/ নেত্রী হয়েও অন্যান্য কিছু দলের সমর্থন নিয়ে সংখ্যালঘু-সরকার গড়তে পারেন, আবার নিছক বৃহত্তম দলের নেতাও হতে পারেন। তবে শর্ত একটাই— তাঁকে লোকসভায় গরিষ্ঠতা দেখাতে হবে।

আমাদের দেশে এই চার ধরনের উদাহরণই আছে। নেহরু তিনবার (১৯৫২, ১৯৫৭ ও ১৯৬২) প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন— প্রত্যেকবারই তাঁর পেছনে ছিল দলের বিপুল প্রাধান্য--- প্রায় ৫০০ আসনের মধ্যে

যথাক্রমে ৩৬৪, ৩৭১ ও ৩৬১টা আসন পেয়েছিল কংগ্রেস। ইন্দিরা গান্ধীর আমলেও (১৯৬৭, ১৯৭১ ও ১৯৮০) কংগ্রেসের আসন ছিল ২৮৩, ৩৫২ ও ৩৫৩। ১৯৭৭ সালে প্রথমবার অ-কংগ্রেসী সরকার গঠিত হয় জনতা দলের মোরারজী দেশাই-এর অধীনে, তাঁর দলের দখলে ছিল ২৯৮টা আসন। রাজীব গান্ধী ১৯৮৪ সালে প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন— তাঁর দলের দখলে তখন রেকর্ড আসনসংখ্যা ৪১২।

বলা বাহুল্য, এমন প্রাধান্যের যুগ তার পরে শেষ হয়ে গিয়েছে। ভি পি সিং ১৯৮৯ সালে প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন একদিকে বিজেপি ও অন্যদিকে বামপন্থীদের সমর্থন নিয়ে। নরসীমা রাও (১৯৯১) একক গরিষ্ঠতা পাননি। ১৯৭৯ সালে চরণ সিং। ১৯৯৬ সালে দেবেগৌড়া ও ১৯৯৭ সালে আই কে গুজরাল প্রধানমন্ত্রীর পদে রয়েছেন কংগ্রেসের সমর্থন নিয়ে। ১৯৯৬ সালে অটলবিহারী বাজপেয়ী বৃহত্তম দলের নেতা হিসেবে ক্ষমতায় বসেছেন, কিন্তু কারও সমর্থন না থাকায় তাঁকে মাত্র ১২ দিন পরে বিদায় নিতে হয়েছে। পরে অবশ্য তিনি একবার প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন কোয়ালিশনের মাধ্যমে। আর সাম্প্রতিককালে মনমোহন সিং দুবার সরকার গঠন করেছেন কংগ্রেস-নেতৃত্বে কোয়ালিশনের মাধ্যমে— অবশ্য তাঁকে বাইরে থেকেও এস পি, বি এস পি, আর জে ডি ইত্যাদি দলের সাহায্যও নিতে হয়েছে। প্রথমবার (২০০৪) কংগ্রেসের আসন-সংখ্যা ছিল মাত্র ১৪৫, দ্বিতীয়বার (২০০৯) ২০৬। প্রথমবার বাজপেয়ীর পেছনে ছিলেন দলের ১৬০ জন। চরণ সিং এবং চন্দ্রশেখর ছিলেন দলছুট ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর নেতা।

সুতরাং বলা চলে— কোন্ দল ক্ষমতায় বসবে এবং কে প্রধানমন্ত্রী হবেন— সেটা বলা কঠিন ব্যাপার। অনেকটাই নির্ভর করে নির্বাচনের ফলাফলের ওপর— কোন্ দল কত আসন পেয়েছে, কে কার/কাদের সঙ্গে কোয়ালিশনে রাজি বা বাইরে থেকে সমর্থন করতে চায়, সাংসদের মধ্যে কেউ বহুজনগ্রাহ্য আছেন কিনা— ইত্যাদি নানা প্রশ্ন এক্ষেত্রে উঠে পড়ে। দেখা যাচ্ছে— দলছুট নেতাও প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন, মাত্র ১৪৫টা আসন পেয়েও একটা দল অন্যের সহযোগিতায় তার নেতাকে ওই আসনে বসাতে পারে।

এক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিরও একটা ভূমিকা থাকতে পারে। ১৭৫ (১) নং অনুচ্ছেদ তাঁকে প্রধানমন্ত্রী— মনোনয়নের ক্ষমতা দিয়েছে। কিন্তু ডঃ বি সি রাউথ মন্তব্য করেছেন, 'Act, 175 (1) is silent as to how the president, shall choose the prime Minister।'--- (ডেমোক্র্যাটিক কন্‌স্টিটিউশান অফ ইন্ডিয়া, পৃ. ১৩১)। তাঁর প্রধানমন্ত্রীকে অবশ্যই লোকসভার আস্থাভাজন হতে হবে— কিন্তু আগেভাগে গরিষ্ঠতা নির্ণয়ের কথা বলা হয়নি। সুতরাং রাষ্ট্রপতি যে কাউকে ওই পদে বসাতে পারেন। ডঃ এস সি কাশ্যপের ভাষায়— 'The President can appoint almost anyone as the Prime Minister'— (আওয়ার কন্‌সিটিউশান, পৃ. ১৪৮)। তাঁর হিসেবে ভুল হতে পারে, সেক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী অকালে বিদায় নেবেন। কিন্তু জটিল অবস্থায় রাষ্ট্রপতির এই 'independent choice' থাকতেই পারে বলে ডঃ হরিহর দাস দাবি করেছেন— (ইন্ডিয়া : ডেমোক্র্যাটিক গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্স, পৃ. ১৭২)।

১৯৭৯ সালে রাষ্ট্রপতি সঞ্জীব রেড্ডী দলছুট সাংসদ চরণ সিংকে নিযুক্ত করেছিলেন জগজীবন রামের সঙ্গত দাবিকে উপেক্ষা করে। ডঃ এ সি কানুয়ের মতে, এটা ছিল 'dead by any canon of constitutional propriety'--- (দ্য ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল সিস্টেম, পৃ. ২২৫)। চব্বিশ দিন পরে চরণ সিং সরে যেতে বাধ্য হন। তখন জগজীবন রাম আবার তাঁর দাবি তুলে ধরেন এবং রাষ্ট্রপতি তাঁকে সুবিবেচনার আশ্বাস দেন।

কিন্তু হঠাৎ তিনি লোকসভা ভেঙে দেওয়ায় ১৯৮০ সালে মধ্যবর্তী নির্বাচন হয় এবং ইন্দিরা গান্ধী হন প্রধানমন্ত্রী— তার ফলে জগজীবন রামের পক্ষে কোনোদিন প্রধানমন্ত্রী হওয়া হয়ে ওঠেনি।

তাছাড়া নির্বাচনের আগে হঠাৎ উঠতে পারে একটা হাওয়া— তাতে আগের সব হিসেব উল্টে যেতে পারে। ডঃ এস এল সিক্রি মনে করেন— ১৯৭১ সালে উঠেছিল 'ইন্দিরা হাওয়া', ১৯৮৪ সালে ইন্দিরা-হত্যার পরে এসেছিল 'Sympathy wave'। তাঁর ভাষায়— Voters, 'Since 1971, have been influanced by the wave prevarling at the time'— (দ্য ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্স, পৃ. ১০৫)। সেটা কংগ্রেসকে দারুণ সাহায্য করেছিল।

এইসব কারণে বিষয়টা বেশ জটিল হয়ে উঠেছে। তবে এরই মধ্যে বলা যায়— নরেন্দ্র মোদীর সম্ভাবনাই বেশি। তার কারণ হলো— বিজেপি ইতিমধ্যেই তাঁর নামটা প্রায় সারা দেশে তুলে ধরতে পেরেছে। দ্বিতীয়ত, বেশ কয়েকটা সংস্থা প্রাক্-নির্বাচনী সমীক্ষায় জানিয়েছে যে, বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ গরিষ্ঠতা পেতে পারে। তৃতীয়ত, বিজেপি তার নমনীয়তার কারণে তার ভিতটা বিস্তৃত করতে পেরেছে— এনডিএ সম্প্রসারিত হয়েছে ডি এম ডি কে, আর পি এম কে, পি ডি পি ইত্যাদি আসার ফলে। কাশ্মীরের ন্যাশনাল কন্‌ফারেন্সেও ফিরে আসতে চাইছে। অন্যদিকে কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা কমছে নানা দুর্নীতি ও কেলেঙ্কারির ফলে। তার লক্ষ্য হলো, 'regaining the lost paradise of power' (ডঃ জে সি জোহারী--- ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্স, পৃ. ৮৯০)। এই কারণে কংগ্রেস নানা দলের সঙ্গে সমঝোতা করে ইউপিএ রয়েছে। কিন্তু ডি এম কে, তৃণমূল, লোকজনশক্তি দল তাকে ছেড়েছে। নতুন কেউ আসতে চাইছে না। তেলুগু দেশম, ওয়াই এস আর, তেলেঙ্গানা রাষ্ট্র সমিতি, বিজু জনতা, সংযুক্ত জনতা, লোকদল— কেউই কংগ্রেসের ব্যাপারে আগ্রহী নয়। এই অবস্থায় তার তেমন কোনো আশা নেই। সম্ভাব্য প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এই দল কাউকে তুলে ধরতেও পারেনি।

সুতরাং শেষ পর্যন্ত, নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হলে আশ্চর্যের ব্যাপার সেটা হবে না। অবশ্য, আগেই বলেছি— সেটা নির্ভর করছে অনেক কিছুর ওপর।

বিশেষ প্রতিবেদন

দিল্লীতে মোগল শাসনের মৃত্যুঘণ্টা কি বাজল?

ডঃ দীনেশ চন্দ্র সিংহ

দিল্লীতে নেহরু বংশের পত্তন করেছিলেন মোগল সম্রাট বাবরের নবম বংশধর ফাররুকশিয়ার। তার রাজত্বকাল ১৭১৩-১৯ খৃস্টাব্দ। নেহরুর পূর্বপুরুষেরা ছিলেন কাশ্মীরের অধিবাসী। কিন্তু অস্তগামী মোগল সাম্রাজ্যের নবম বংশধর ফাররুকশিয়ার নেহরুদের পূর্বপুরুষকে দিল্লীতে এনে পুনর্বসতি দান করেন। নেহরু জওহরলাল তাঁর আত্মজীবনীতে সে ইতিহাস বর্ণনা করেছেন।

মোগল সম্রাট ফাররুকশিয়ার (তখন বলতে গেলে নামেই সম্রাট, সাম্রাজ্যের বেশির ভাগ হাতছাড়া) কাশ্মীর ভ্রমণে গেলে এই রাজ-কাউলের সঙ্গে পরিচয় ঘটে এবং তার নির্দেশে কাউল পরিবারকে দিল্লীতে এক 'নহর'-এর (খালের) পাড়ে এক বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করা হয়। তখন থেকে নেহরুদের কৌলিক উপাধি---কাউল-নেহরু। কালক্রমে ব্যাঙাচির লেজ থাকার মতো 'কাউল' খসে গিয়ে নেহরু উপাধিই চিরস্থায়ী হয়ে রইল— খাল কেটে কুমির ঢোকানোর মতো নেহরুবংশও খাল বেয়ে ভারতের রাজধানীকে পাকাপোক্ত আসন দখল করল।

শুধু দিল্লীতে তোলেননি, সম্রাট কাউল পরিবারের থাকার ব্যবস্থা, তাদের ভরণপোষণের জন্য জায়গিরের বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন। নেহরুজী লিখেছেন :

"A jagir with a house situated on the banks of a caual had been granted to Raj Kaul, and from the fact of this residence 'Nehru' (from nahar, a caual) came to be attached to his name. Kaul had been the family name; this changed to Kaul-Nahru; and in latter years, ; 'Kaul' dropped out and we became siply Nehrus."

নেহরুদের এতোবড় হিতাকাঙ্ক্ষী ফাররুকশিয়ার জ্ঞানী গুণী বিধর্মীর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বলে তেমন কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না; তেমনি রাজ কাউলের সংস্কৃত ও পার্শী ভাষায় গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় জ্ঞাপক কোনো নিদর্শনও হলেও হতে পারেন। তাই নিজের কাছাকাছি এনে দিল্লীতে বসবাসের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

আর ফাররুকশিয়রের ব্যক্তিগত চরিত্রও তেমন উজ্জ্বল ও আদর্শস্থানীয় ছিল না। ইতিহাসকারের মতে— "ফাররুকশীয়রের নির্দেশে জাহান্দার শাহকে দিল্লী দুর্গে শ্বাসরোধ করিয়া হত্যা করা হয়।... অতঃপর ফাররুকশিয়ার দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ফাররুকশিয়ারের রাজ্যশাসনের কোনও যোগ্যতা ছিল না। তাছাড়া তিনি ছিলেন ভীরু ষড়যন্ত্র প্রিয়। তাঁর পৃষ্ঠপোষক সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রতি অকৃতজ্ঞের মতো আচরণ করিতে থাকেন। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহারা সম্রাটের চোখ অন্ধ করিয়া দেন এবং সিংহাসন হইতে তাহাকে অপসারিত করিয়া হত্যা করেন।" (ভারত পরিচয়— নিশীথ রঞ্জন রায়)

এহেন চরিত্রের ফাররুকশিয়ার নেহরুদের পূর্বপুরুষ রাজ কাউলের হিতৈষী ও গুণগ্রাহী হলেন কিসের বিনিময়ে?

সেকথা উহ্য থাক; তবে মোগলদের প্রতি নেহরু বংশের কৃতজ্ঞতাবোধে কখনো খামতি ঘটেনি। তারা মোগলাই জীবনযাত্রায় যেমন অভ্যস্ত ছিলেন, তেমনি মুসলমানদের সঙ্গে পারিবারিক সম্পর্কে স্থাপন ও বন্ধনে আবদ্ধ হতেও তাদের বাধেনি। যেমন— নেহরু-কন্যা সাদি করেছিলেন এলাহাবাদে নেহরু পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মদের ব্যবসায়ী নওয়ার খানের পুত্র ফিরোজ খানকে (ফল্স গান্ধী) তার পুত্রদ্বয় রাজীব ও সঞ্জীব (মিথ্যা নাম সঞ্জয়) নির্ভেজাল মুসলমান সন্তান। রাজীব আবার খৃস্টান ধর্মান্তরিত হয়ে বিয়ে করেছে খৃস্টান মহিলা সোনিয়া মাইনোকে। গান্ধী পরিবারের এই ধর্মীয় গড়বড় দেখেই হিন্দু মন্দিরের পূজারিরা তাদের কোনো মন্দিরে ঢুকতে দেয় না— তা তারা যতই কপালে সিন্দুর-চন্দনের ফোঁটা পরেন না কেন; তারা ধর্মত্যাগী বই আর কিছু নয়। সিন্দুর-চন্দনের ফোঁটা শুধু হিন্দুদের বোকা বানাবার ধোঁকা দেবার কৌশলমাত্র।

মোগলদের প্রতি নেহরু গোষ্ঠী এতই কৃতজ্ঞতা-পরায়ণ যে, নেহরুজী কাবুলে গিয়ে বাবরের সমাধিস্থান পরিদর্শন করেন। আর তার কন্যা ইন্দিরা গান্ধীও যে কাবুলে গিয়ে বাবরের কবরস্থানে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন তার সাক্ষ্য দিয়েছেন তাঁর সফরসঙ্গী তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কে. নটবর সিং। তাঁর গ্রন্থে— (Profiles & Letters, Pages 167) :

"...On the third day, she had an hour free. 'Let us go for a drive', she said to me. In a few minites. We were outside the city limits of Kabul. Here eyes caught a patch of green on the hill to the left of the road. we were told it was the resting place of Babur (1483-1530 AD). ...So up the hill we went, ...The Prime Minister of India stood there, with head slightly bowed, paying her hourage."

ভারত আক্রমণকারী, অযোধ্যায় রামমন্দির ধ্বংসকারী মোগল সম্রাট বাবরের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন কি এমনি এমনি! কৃতজ্ঞতাবোধ বলে তো কথা! ভারত স্বাধীন হয়েছে বটে; কিন্তু ৯০ শতাংশ হিন্দুর দেশের সংবিধান থেকে হিন্দু, হিন্দুত্ব ও হিন্দুধর্মকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে ইসলামী দ্বিজাতিতত্ত্বকে প্রাধান্য দান করে পৃথক পারিবারিক আইনের বিধান বজায় রাখা নেহরুদের ইসলামী ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্যই সূচিত করে বই কি!

বর্তমান নির্বাচনের ফলাফলের প্রেক্ষিতে নেহরু ঘরানার শেষ প্রদীপ শিখাটি নির্বাপিত হলে দেশবাসী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে।

ব্রহ্মা-নারদ সংবাদ বিষয় নরেন্দ্র মোদী

কল্যাণ ভঞ্জ চৌধুরী

চৈত্রের সকালবেলা। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর পঞ্চমুখ ব্রহ্মা খুবই বিষণ্ণ। তাঁর চারপাশে ঘিরে বসে আছেন বিভিন্ন দেব ও দেবী। ইন্দ্র, কৃষ্ণ, শিব, নারদ ও অশ্বিনী কুমারদ্বয়, লক্ষ্মী, ইন্দ্রাণী, দুর্গা, সরস্বতী। তাঁরা সকলে ব্রহ্মার বিষণ্ণ মুখ দর্শন করে উদ্বিগ্ন এবং পরস্পরের মুখের দিকে চাওয়াচাওয়ি করছেন।

একসময় ব্রহ্মা ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন, দেবদেবীরা তোমরা অকস্মার ঢেঁকি। শ্রীব্রহ্মার পাঁচটি মুখ। তাঁর কোন মুখ দিয়ে কথাগুলি নিষ্ক্রান্ত হল তা শ্রোতারা প্রথমে বুঝতে পারেননি। পরে বুঝতে পারলেন। তিনি ক্রুদ্ধ হলে যে মুখ দিয়ে কথা নিষ্ক্রান্ত হয়, সেই মুখ দিয়ে। শ্রীব্রহ্মা বলে চললেন— এটা খুব বেদনাদায়ক ব্যাপার যে ভারতবর্ষে শীঘ্রই ষোড়শ লোকসভার নির্বাচন হচ্ছে। পৃথিবীর সব দেশ থেকে রিপোর্টাররা গিয়ে তাদের দেশের রাষ্ট্রনায়কদের কাছে প্রথম দফা রিপোর্ট পেশ করেছেন, অথচ আমার কোনো রিপোর্টাররা ভারতবর্ষে গিয়ে আসন্ন লোকসভা নির্বাচন সম্বন্ধে কোনো খবর দিল না। এর চেয়ে অপদার্থতা আর কী থাকতে পারে!

শুনে দেব-দেবীরা মাথা হেঁট করলেন। ব্রহ্মা বললেন, 'হে নারদ, তুমি আমার শ্রেষ্ঠ রিপোর্টার। সেই সত্যযুগ থেকে সব বিষয়ে রিপোর্ট করে এসেছ। কিন্তু তুমি ভারতে আসন্ন নির্বাচনের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কেন নীরবতা প্রদর্শন করেছ? আমি দেখছি তুমি ইদানীং সংবাদ সংগ্রহ অপেক্ষা বীণা বাদনে বেশি আগ্রহ দেখাচ্ছ। এর কারণ কী? এই বৃদ্ধ বয়সে তুমি কি কোনো অপ্সরা উর্বশীর হৃদয় জয় করার জন্য বীণা বাদনে বেশি সময় দিচ্ছ?

নারদ করজোড়ে বললেন, হে বিশ্বস্রষ্ঠা সর্বজ্ঞ, বিগত তিন মাস ধরে আপনি ধ্যানমগ্ন ছিলেন, ফলে আপনার অনুমতি নিতে পারিনি। আপনি আজ্ঞা করুন, আমি সাতদিনের মধ্যে সংবাদ সংগ্রহ করে দেব।

ব্রহ্মা সানন্দে বললেন, তথাস্তু, তুমি সাতদিনের মধ্যে সংবাদ সংগ্রহ করে আমাকে দেবে। আমি খুশি হয়ে তোমার সঙ্গে সেই অপ্সরা, কিন্নরী বা উর্বশীর বিবাহ দেব যার হৃদয় হরণ করার জন্য তুমি দিবারাত্রি বীণা বাদন করছ।

নারদ শির আন্দোলিত করে স্থান ত্যাগ করলেন। এবং কিছুক্ষণ বাদেই ঢেঁকিতে উঠে ভারতে উপস্থিত হলেন।

সাতদিন বাদে নারদ ভারতের সাম্প্রতিক সংবাদ সংগ্রহ করে শ্রীব্রহ্মার সম্মুখে উপস্থিত হলেন। নারদের মুখ থেকে সংবাদ শ্রবণ করার জন্য ব্রহ্মার সভায় দেবদেবীরা অনেক আগেই উপস্থিত হয়েছিলেন। শ্রীনারদ উপস্থিত হলে তাঁরা হাত নেড়ে, রুমাল উড়িয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন।

অতঃপর ব্রহ্মা বললেন, বৎস, তুমি যা-যা সংবাদ এনেছ তা আমাদের সংক্ষেপে বিবৃত কর। আমি তোমাকে তোমার মনোমত নারীরত্নের সঙ্গে বিবাহ দেব।

নারদ তখন ঝর্ণার ধারার মতো মিষ্টকণ্ঠে বললেন, আমি ঢেঁকিতে চড়ে ভারতের উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম সর্বত্র ভ্রমণ করেছি। বিভিন্ন নেতা-নেত্রীদের সাক্ষাৎকার নিয়েছি। শ্রবণ করুন।

এবারকার নির্বাচনী যুদ্ধে সবার উপরে যাঁর নাম উঠে এসেছে তিনি গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনরেন্দ্র মোদী। এঁকে বিজেপি দল প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য মনোনীত করেছেন। মজার কথা, এঁকে ও এঁর দলকে পরাজিত করার জন্য সব দল একত্রিত হয়েছে। এঁর প্রধান প্রতিপক্ষ বর্তমানে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস। কিন্তু এঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছে প্রধান প্রধান দলের নেতা ও নেত্রীরা। যথা, সমাজবাদী দল, ডি এম কে, কমিউনিস্ট দল, তৃণমূল দল, রাষ্ট্রীয় জনতা দল, ন্যাশনাল কনফারেন্স দল, বহুজন সমাজ পার্টি-সহ আরও আধ ডজন দল। এই দলগুলির একমাত্র বক্তব্য, মোদীজী সাম্প্রদায়িক, মোদীজী স্বৈরতন্ত্রী, মোদীজী নারী বিদ্বেষী— এককথায় তিনি দেশ তথা জাতির শত্রু। কিন্তু মজার কথা, বিরোধীরা যতই তারস্বরে মোদীজীর নিন্দা করছেন, ততই তাঁর জনপ্রিয়তার পারদ বেড়ে চলেছে। মোদী হাওয়ায় বিরোধী শিবির ছিন্নভিন্ন হওয়ার দশা হয়েছে। তাঁর প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি। আসলে মোদীজী এমন সব কথা বলছেন, যা অন্য দলের নেতা-নেত্রীরা বলতেন না। তিনি কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন দুর্নীতিগ্রস্ত গান্ধী পরিবারকে অপসারিত করার শপথ নিয়েছেন। প্রত্যেক জাতি ও সম্প্রদায়কে ন্যায়ের ভিত্তিতে সুরক্ষা ও উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। মুসলমানদের পৃথক কোনো সুযোগ না দেবার কথা বলেছেন। বাংলাদেশী অবৈধ অনুপ্রবেশকারীরা যাদের সংখ্যা প্রায় চার কোটি এবং যারা ভারতের অর্থনীতি তথা নিরাপত্তার পক্ষে বিপদস্বরূপ তাদের উচ্ছেদ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কাশ্মীর সমস্যা সমাধান করার কথা বলেছেন, চীনের সঙ্গে সীমান্ত সমস্যা মেটানোর সংকল্প নিয়েছেন। নিজের রাজ্য গুজরাটের মতো সমস্ত রাজ্যে আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নের রূপরেখা প্রস্তুত করেছেন।

মোট কথা, মোদীজী দেশের মানুষের হৃদয়ে আশা জাগিয়েছেন এবং নিষ্প্রাণ হতাশাগ্রস্ত জাতির প্রাণে সাড়া জাগিয়েছেন। হে পঞ্চমুখ ব্রহ্মা! এই হল ভারতের আসন্ন নির্বাচন সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত সংবাদ। নারদের বিবৃতি শুনে ব্রহ্মা সাধু-সাধু বলে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। ব্রহ্মার দেখাদেখি নারায়ণ, মহাদেব, ইন্দ্র, অশ্বিনী কুমারদ্বয়-সহ অন্যান্য দেবতারা তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। উর্বশী, কিন্নরী, অপ্সরারা শ্রীনারদের করমর্দন করলেন।

তাঁরা চলে গেলে নারদ একান্তে ব্রহ্মাকে বললেন— হে বিশ্বস্রষ্টা, আপনি আমার বিবাহ দেবেন বলেছিলেন। কিন্তু ততক্ষণে ব্রহ্মা আবার ধ্যানমগ্ন হলেন। নারদের কথা নারদের মুখেই থেকে গেল।

কাঁঠাল-বাবা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারতবর্ষ মুনি-ঋষিদের দেশ। অতি প্রাচীনকাল থেকে মুনি-ঋষিগণ সাধনার ক্ষেত্র হিসাবে নির্জন-দুর্গম পর্বতকে বেছে নিয়ে ঈশ্বরের সাধনা করেন। আবার কিছু সাধুপুরুষ আছেন যাঁরা প্রাচীনকালের মুনি-ঋষিদের মতো দুর্গম পর্বতকে সাধনার ক্ষেত্র হিসাবে বেছে না নিয়ে মানুষের কল্যাণের জন্য এই সমাজেই থেকে গিয়েছেন। যেমন যোগগুরু বাবা-রামদেব, রবিশঙ্কর— এরকম অনেক নিষ্ঠাবান সাধক জগতের কল্যাণের জন্য কাজ করে চলেছেন।

এরকমই একজনের সন্ধান পাওয়া গেছে ওড়িশার নয়াগড় জেলার দশপল্লার কাছে অবস্থিত বরদায়িনী পাহাড়ে। যার নাম শুনলে হয়তো অনেকেই অবাক হবেন। কারণ তিনি হলেন অবিনাশ দাস। স্থানীয় লোকেরা তাঁকে 'কাঁঠাল বাবা' বলে ডাকেন।

ওড়িশার জগতসিংহপুর জেলায় তাঁর জন্ম। কাঁঠাল বাবা খুব ছোটবেলায় ঈশ্বর সাধনার জন্য হিমালয়ের কন্দরাওতে চলে যান, কিন্তু কিছুদিন সাধনার পর গুরুর আদেশে মানুষের কল্যাণের জন্য নিজের এলাকায় চলে আসেন। তারপর এখানে মানুষের মধ্যে ধর্মীয় চেতনা ও আধ্যাত্মিক ভাব জাগরণের জন্য একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। আধ্যাত্মিকতার পাশাপাশি দরিদ্র অসহায় মানুষের জন্যও কাজ শুরু করেন।

প্রথমে তিনি বরদায়িনী পাহাড়ে যেখানে একটি গাছ ছিল না সেখানে গাছ লাগানোর পরিকল্পনা করেন যাতে স্থানীয় মানুষের যে কোনো ভাবে উপকারে লাগে। সেই মতো এই পাহাড়ে তিনি কাঁঠাল গাছ লাগানোর উদ্যোগ নেন। যখন সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেন যে, আপনি কাঁঠাল গাছকে বেছে নিলেন কেন? তাঁর উত্তর, কাঁঠাল হলো একটি উপকারী ফল। স্থানীয় মানুষ এই ফল পাকা খেতে পারেন এবং কাঁচা অবস্থায়ও রান্না করে খেতে পারেন। এই গাছ সারাবছর সাধারণ মানুষের কাজে লাগে। আরো বলেন, এখানকার জলবায়ু অনুযায়ী অন্য গাছের থেকে কাঁঠাল গাছ অল্প পরিশ্রমেই বড় করা ও বাঁচানো সম্ভব, তাই তিনি কাঁঠাল গাছকে বেছে নিয়েছেন।

আজ থেকে ৩০ বছর আগে যেখানে একটি গাছও ছিল না আজ এখানে কাঁঠাল গাছে ভরা। তার পুরো কৃতিত্ব এই কাঁঠালবাবার প্রাপ্য। কাঁঠাল বাবা বলেন যে, এখানে জল-সঙ্কটের কারণে প্রথমে পাথর কেটে গর্ত করে জল জমিয়ে এই গাছগুলিকে বাঁচানো হয়েছে। প্রথম প্রথম গাছের চারা লাগানোর পর আশেপাশের গ্রামের মানুষ গোরু-ছাগল দিয়ে খাইয়ে দিত, তারজন্য তিনি গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে গিয়ে গাছের উপকারিতার কথা সকলকে বোঝান। গ্রামবাসীর সহযোগিতায় ধীরে ধীরে বরদায়িনী পাহাড় কাঁঠাল গাছে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

এখন আশেপাশের গ্রামের মানুষের যে-কোনো অনুষ্ঠানে শুধু কাঁঠাল নয়, বিভিন্ন রকম ফলের যোগান এখান থেকেই হয়ে থাকে। শুধু তাই নয়, এই জঙ্গলে উৎপন্ন কাঁঠাল পুরীর মন্দিরে প্রভু জগন্নাথের পূজায় ভোগের জন্য যায়। তাই এই মানুষটি আজ সকলের কাছে 'কাঁঠাল-বাবা' নামে পরিচিতি পেয়েছেন। প্রতিটি কাঁঠাল গাছকে তিনি সন্তানের মতো ভালোবাসেন।

Design's For Modern Living
Neycer
NATIONAL PIPE & SANITARY STORES
Sales Office : 3, Jadu Nath Dey Road, Kolkata-12,
Ph. 2215-6804, Fax : 2212-2803
54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831 / 33

DAS STEEL UDDYOG

Naldubi, Mangalbari, Po.+Dist. : Malda

সকল প্রকার স্টীল ফার্ণিচার,
গ্রীলগেট এবং ফেব্রিকেশনের
কাজ করা হয়

Show Room

—ঃ যোগাযোগের ঠিকানা ঃ—

GEETANJALI FURNITURE

Jhaljhalia, Station Road, Malda

Phone : 03512-266063,

Mobile : 9733387091

Ori Plast

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833

3, Jadu Nath Dey Road, Kolkata-12, Ph. 2215-6804, Fax : 2212-2803

PARTHA SARATHI CERAMICS

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

"এসো আমরাও মহৎ কাজে প্রবৃত্ত হই। আমরা যেন ছোট ছোট কাজেও বিশ্বস্ত থাকি। একটি ছোট স্ক্রু, একটি ছোট চাকা, যত ক্ষুদ্র হোক, একটি বড় যন্ত্রকে বিকল করে দিতে পারে। আমরা যেন দায়িত্বশীল এবং বিশ্বস্ত থাকি। আমাদের প্রতিজ্ঞাই আমাদের বন্ধনসূত্র হোক।"

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

পুস্তক প্রসঙ্গ

বাঁকুড়া জেলায় রামায়ণের প্রভাব নিয়ে গবেষণা সম্ভবত এই প্রথম

কল্যাণ ভঞ্জচৌধুরী

বিপ্লব বরাট লিখিত ‘বাঁকুড়ার লোকমাহাত্ম্য ও লোকসংস্কৃতিতে রামায়ণের প্রভাব’ জেলা ভিত্তিক গবেষণার একটি উৎকৃষ্ট নির্দশন। ক্ষুদ্র আয়তনের এই গ্রন্থে লেখক-গবেষক

শ্রীবরাট বাঁকুড়ার ছোট-বড় খ্যাত-অখ্যাত যাবতীয় মন্দির, পূজা-পার্বণ, লোকাচার, লোকসঙ্গীতজ্ঞ, লেখক-গবেষক, দর্শনীয় স্থান ইত্যাদির পরিচয় দিয়েছেন। এই হিসেবে গ্রন্থটি একটি ডাইরেকটরি। বলা বাহুল্য এই ধরনের গ্রন্থ রচনা করতে দক্ষ গবেষকমণ্ডলীর প্রয়োজন হয়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং তার আগে বৃটিশ সরকার জেলা গেজেটিয়ার প্রণয়ন করেছে। কিন্তু এই গেজেটিয়ারগুলির অনেক তথ্য পুরোনো হয়ে গেছে। যেমন হয়েছে বাঁকুড়া জেলার। শ্রীবরাট তাঁর গ্রন্থে বাঁকুড়া জেলা সম্পর্কে সাম্প্রতিকতম তথ্য সংযোজন করেছেন। এবং সম্পূর্ণ একা এই কাজ সম্পন্ন করেছেন। এ জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দিতে হয়। এই গ্রন্থের যে বিষয়টি আলোচনা না করলে আমাদের মূল্যায়ন অসম্পূর্ণ থাকবে সেটি হলো লেখক গবেষক শ্রীবরাট বাঁকুড়া জেলার সংস্কৃতির উপর রামায়ণের প্রভাব বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। ভারতের সংস্কৃতির উপর রামায়ণের প্রভাব নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। কিন্তু কোনো একটি জেলার উপর বিশেষত বাঁকুড়ার মতো ঐতিহ্যসমৃদ্ধ জেলার উপর রামায়ণের প্রভাব নিয়ে গবেষণা সম্ভবত এই প্রথম। এবং সেই হিসেবে তিনি এই ক্ষেত্রে পথিকৃতের সম্মান পাবেন। তবে একটি কথা— গ্রন্থটি খুবই স্বল্প আয়তনের। এই ধরনের গ্রন্থ একটু বড় আয়তনের না হলে সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। শ্রীবরাট এই বিষয়টি নজর দিলে ভালো করতেন।

বাঁকুড়ার লোকমাহাত্ম্য ও লোকসংস্কৃতিতে রামায়ণের প্রভাব।। বিপ্লব বরাট। নির্দশন সাহিত্য প্রকাশনী, বাঁকুড়া— মূল্য ৫৪ টাকা। পৃষ্ঠা ৮০।

× × ×

প্রীতীশ তালুকদার লিখিত ‘আত্মঘাতী হিন্দু...উত্তরণের পথ’ গ্রন্থটির নামকরণের মধ্যে গ্রন্থটির মূল বক্তব্য নিহিত আছে। লেখক গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে দেখিয়েছেন হিন্দুজাতি কীভাবে যুগের পর যুগ ধরে বিদেশীদের হাতে কত সহজে পরাস্ত হয়েছে— কীভাবে বিজাতীয়েরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের উপর অনায়াসে প্রভুত্ব বিস্তার করেছে, তাদের সবলে ধর্মান্তরিত করেছে, তাদের সংস্কৃতি পদদলিত করেছে। হিন্দু ধর্মকে সবচেয়ে আঘাত হেনেছে মুসলমান ধর্ম যা এখনও করছে। লেখক স্বভাবতই এর কারণ অনুসন্ধান করেছেন। তিনি সবিস্তারে দেখিয়েছেন জাতিভেদ হিন্দুদের ধ্বংসের সবচেয়ে বড় কারণ। নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু— অর্থাৎ শূদ্রদের উপর অত্যাচার তাদের সমাজের মূলস্রোত থেকে সরিয়ে দেওয়ার ফলে তারা দলে দলে ধর্মত্যাগ করেছে। তিনি অন্য কারণও দেখিয়েছেন। সেটি হলো হিন্দুদের মধ্যে ঐক্যের অভাব। তাদের মধ্যে কোনো বজ্রকঠিন সংগঠন নেই। শ্রী তালুকদার খুব স্পষ্ট করে

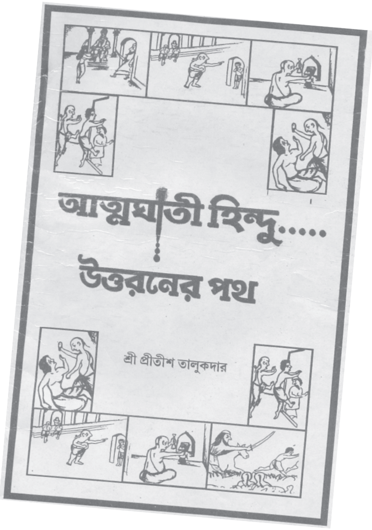

বলেছেন, হিন্দুদের সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে এবং এতে যদি তাদের সাম্প্রদায়িক আখ্যা পেতে হয় তাতে শঙ্কিত হওয়া চলবে না। আর যেটা দরকার সেটা হলো জাতিভেদ প্রথাকে ভেঙে চুরমার করা। ‘নান্য পন্থা বিদ্যতেহয়নায়’। আমরা গ্রন্থটির আশু প্রচার কামনা করি। যদি লেখকের বক্তব্য পাঠকদের অন্তর স্পর্শ করে তবে গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য সফল হবে।

আত্মঘাতী হিন্দু...উত্তরণের পথ।। প্রীতীশ তালুকদার। বিবেকানন্দ সাহিত্য কেন্দ্র, কলকাতা—মূল্য ২৫ টাকা। পৃষ্ঠা ৮০।

সংস্কার ভারতীর নববর্ষ আবাহন উৎসব এবং সাংস্কৃতিক দেওয়ালপঞ্জীর উন্মোচন

গত ১২ এপ্রিল শনিবার রামমোহন মঞ্চে নববর্ষ আবাহন উৎসবে সংস্কার ভারতীর দেওয়াল পঞ্জীর লোকার্পণ করলেন গোড়ীয় নৃত্য শিল্পী শ্রীমতী মহুয়া মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন প্রান্তের সভাপতি বিশিষ্ট অভিনেতা ও নাট্যকার তপন গঙ্গোপধ্যায়। সংস্কার ভারতীর উপদেষ্টা মণ্ডলীর অন্যতম বিকাশ ভট্টাচার্য তাঁর বক্তব্যে দেওয়াল পঞ্জী প্রকাশের পৃষ্ঠভূমি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উল্লেখ করেন— স্বনামধন্য অভিনেতা ভিক্টর বন্দ্যোপ্যাধায়ের অনুপ্রেরণায় ২০০৫ সাল থেকে প্রায় নিয়মিত প্রতি নববর্ষে এটি প্রকাশিত হয়ে আসছে। বাংলা ১৪২১ সালের দেওয়ালপঞ্জীর বিষয় 'বাংলার দেবদেউল'। প্রসঙ্গত তিনি উল্লেখ করেন বিগত বছরগুলিতে বাংলার পার্বণ, বাংলার উৎসব, ডাকঘর নাটকের শতবর্ষ, ১৮৫৭ সালের সার্ধশত বছর, স্বামীজীর জীবনভিত্তিক চিত্রাবলি ইত্যাদি ছিল দেওয়ালপঞ্জীর বিষয়। মহুয়া মুখোপাধ্যায় তাঁর বক্তব্যে দেওয়ালপঞ্জীর ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং এই দেওয়াল পঞ্জীতে উল্লিখিত অনন্তবাসুদেব মন্দিরের কথা স্মৃতিচারণা করে বলেন, এই মন্দির গাত্রের কারুকার্য এবং মূর্তি তাঁকে গোড়ীয় নৃত্যশৈলীর প্রতি আকৃষ্ট করে। তিনি তখন নবম শ্রেণীর ছাত্রী। এবং পরবর্তী জীবনে তাঁকে গৌড়ীয় নৃত্য গবেষণায় অনুপ্রাণিত করেছে। মঞ্চে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সুভাষ ভট্টাচার্য।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পর্বের সংস্কার ভারতী শিল্পীদের সমবেত সঙ্গীত এবং উদ্বোধনী সঙ্গীতে উত্তর কলকাতা শাখার শিল্পীদের প্রয়াস নববর্ষ আবাহন অনুষ্ঠানে ছিল সময়োচিত। বিশিষ্ট শিল্পী ধ্রুবজিৎ ভট্টাচার্যের ভাবগম্ভীর কণ্ঠ শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছিল। এরপর সুমনা পালভট্টাচার্যের পরিচালনায় বিধাননগরের রূপান্তর সংস্থাটির উপভোগ্য পরিবেশন নৃত্যনাটিকা 'তুষার মালা বোন ও সাতটি বামন ভাই'। সাতটি বামন এবং তুষার মালা ও দুষ্টু রানীর ভূমিকায় শিশু শিল্পী যথাক্রমে শ্যামলী ও মেঘা প্রশংসার দাবি রাখে। আবহসঙ্গীত, দৃশ্য সজ্জা ইত্যাদিতে অনুষ্ঠানটি একাধারে শিশু ও বড়দের অত্যন্ত মনোগ্রাহী হয়েছিল। সংস্কার ভারতী ব্যান্ডেল শাখার জলতরঙ্গ বাদন ছিল এদিনের শেষ অনুষ্ঠান। বর্তমানে প্রায় অপ্রচলিত জলতরঙ্গ বাদন, ঢোল, শ্রীখোল, তবলা ও কণ্ঠের সুরারোপে অনবদ্য হয়েছিল। মূল পরিচালনা এবং জলতরঙ্গ বাদক শৈবাল সেনগুপ্ত। সহকারী হিসাবে সৌমেন চট্টোপাধ্যায়, সিতাংশু মণ্ডল, সুদাম মণ্ডল, কল্যাণী সেন ও শম্পা মণ্ডলের প্রয়াস সমগ্র অনুষ্ঠানটিকে একটি বিশেষ মাত্রা দেয়।

সমাবেশ সমাচার

অলচিকি হরফে 'বিবেকানন্দ' প্রথম গ্রন্থাকারে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ এই প্রথম অলচিকি হরফে স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও কর্মকাণ্ড এক মলাটের মধ্যে ধরে রাখার প্রয়াস দেখা গেল। কাজটি বিবেকানন্দের জন্মসার্ধশতবর্ষকে সামনে রেখে দেশবাসীর কাছে লেখক-প্রকাশক এবং উদ্যোক্তাদের এক অনন্য প্রয়াস। এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন স্বরূপ ভট্টাচার্য। মঞ্চে গবেষক স্বরূপবাবুর সঙ্গে ছিলেন বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য ড. সুজিত বসু ও বীরভূম মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ড. পার্থসারথি মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানের শেষলগ্নে গ্রন্থটির প্রাণপুরুষ লেখক সনৎ হাঁসদা এসে উপস্থিত হন উদ্যোগী সংগঠন 'আইডিয়া'-র কর্ণধার সোমেশ্বর বড়ালের বিশেষ অনুরোধে। সনৎবাবু বিশ্বভারতীর অধ্যাপক। তাঁর পরিশ্রমে ও তত্ত্বাবধানে গ্রন্থটি মুদ্রণ ও প্রকাশ সম্ভব হয়েছে বলে সঞ্চালক সোমেশ্বর বারবার দর্শক শ্রোতাদের উদ্দেশে বলেন। অনুষ্ঠানে বাড়তি সংযোজন ছিল সিউড়ী সরস্বতী শিশু মন্দির ও ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের রাণীশ্বর শাখার ছাত্রছাত্রী ও আশ্রমিক শিক্ষার্থীদের সঙ্গীতানুষ্ঠান।

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

স্বস্তিকা

পড়ুন ও পড়ান

কলকাতায় সংস্কৃত সম্ভাষণ শিবির

সংস্কৃতভারতীর কলকাতা শাখা পরিচালিত দশ দিবসীয় সংস্কৃত সম্ভাষণ শিবির অনুষ্ঠিত হলো কলকাতার বালীগঞ্জ লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে। সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে প্রায় ২৫ জন এই শিবিরে অংশগ্রহণ করেন। ১১-২০ এপ্রিল প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬-৮টা এই সম্ভাষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

এই শিবিরের শিক্ষক ছিলেন কমলাকান্ত মিস্ত্রী। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তিনি সরল সংস্কৃতের মাধ্যমে ২০ বছর থেকে ৭০ বছর পর্যন্ত বিভিন্ন বয়সের ছাত্রছাত্রীদের সংস্কৃত বলার পদ্ধতি শেখান। দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিভাবে সংস্কৃত প্রয়োগ করা যায় তা ছাত্রছাত্রীদের নিপুণভাবে আয়ত্ত করান।

গত ২০ এপ্রিল সন্ধ্যায় এই শিবিরের সমাপ্তি কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীরা সংস্কৃতে গান, শ্লোক, অনুভব কথন ও সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা উপস্থাপন করেন। অনুষ্ঠানের মুখ্য বক্তা সংস্কৃতভারতী দক্ষিণবঙ্গের সংগঠন সম্পাদক প্রণব নন্দ বর্তমান প্রেক্ষাপটে সংস্কৃতের গুরুত্ব তুলে ধরেন। বর্তমানে ভারতের ভাষা সমস্যার সমাধানে সংস্কৃতই যে একমাত্র সমাধান তার উল্লেখ তিনি করেন।

মঙ্গলনিধি

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের হুগলী জেলার মাখাণ্ডী শাখার প্রবীণ স্বয়ংসেবক মানিক ঘোষ তাঁর ভাই দুলাল ঘোষের একমাত্র কন্যা বিনতা ও বিপ্লব অধিকারীর শুভ পরিণয় উপলক্ষে সমাজের সেবার জন্য মঙ্গলনিধি সমাজ সেবা ভারতী ও ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘকে প্রদান করেন। সমাজ সেবা ভারতীর পক্ষে সনৎ বসুমল্লিক ও কিষাণ সঙ্ঘের পক্ষে পশ্চিমবঙ্গের সভাপতি নন্দলাল কাট মঙ্গলনিধি গ্রহণ করেন।

শোকসংবাদ

উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সেবাপ্রমুখ অজিত পালের মাতৃদেবী নিশারানি পাল কোচবিহারের বাড়িতে গত ১৯ মার্চ রাত্রে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। তিনি ৫ পুত্র, পুত্রবধূ ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

'শ্রদ্ধা'-র শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান

গত ২২ চৈত্র ১৪২০ রবিবার, সিউড়ী সঙ্ঘশাখার প্রথম মুখ্যশিক্ষক পূর্ণকিশোর দাস বড়ালকে তাঁর ভদ্রাসনে 'শ্রদ্ধা'র বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করা হলো। সহস্র পূর্ণচন্দ্র দর্শনকারী বড়ালের বর্তমানে ৮৪ বৎসর বয়স।

অবিভক্ত বাংলার দিনাজপুরে বাল্যকালেই শ্রীবড়াল সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক হন। পরে ওপার বাংলা থেকে এসে সিউড়ীতে বসবাস শুরু করেন। সঙ্ঘকাজ ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কাজ তিনি দীর্ঘদিন ধরে শহরে দায়িত্ব নিয়ে করেছেন। উক্ত মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান তিনবার 'ওঁ'কার ধ্বনি দিয়ে শুরু হয়। মঙ্গলদীপ প্রজ্বলন করেন সিউড়ী রামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক গোপেন্দ্র প্রসাদ বড়াল। তিনি শ্রীবড়ালের ভাইপো। সঙ্গীত পরিবেশন করেন তাঁর ভাগনি কাকলি দাস ও প্রাস্তাবিক ভাষণ দেন বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বেণীমাধব বিদ্যালয়ের শিক্ষক পতিতপাবন বৈরাগ্য।

মালদায় মোদীর জন্য যজ্ঞ

গত ১৮ এপ্রিল মালদা জেলার বুলবুলচণ্ডী সাহাপাড়াতে এক অভিনব যজ্ঞের আয়োজন করা হয়। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পরিচালনায় এবং 'বঙ্গীয় পুরোহিত সমাজ'-এর সহযোগিতায় বিজেপি-র প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী নরেন্দ্র মোদীকে প্রধানমন্ত্রী রূপে দেখতে চেয়ে এই যজ্ঞের আয়োজন করা হয়। রামদেবজীর ভারত স্বাভিমান ট্রাস্ট ও যুবাভারতের পক্ষ থেকেও এই যজ্ঞ সফল করার জন্য ব্যানার ও পতাকা লাগানো হয়েছিল। হবিবপুর, তিলাসন-সহ বুলবুলচণ্ডী থেকে প্রচুর মানুষ এই যজ্ঞে যোগদান করে আহুতি প্রদান করেন। উপস্থিত ছিলেন বিশ্বহিন্দু পরিষদের প্রচার প্রমুখ শঙ্কর সিংহ, বিশ্বজিৎ রায়, জন্মেঞ্জয় প্রসাদ ও অশোক প্রসাদ, পুরোহিত সমাজের পক্ষে বিধান পাণ্ডে, গোবিন্দ ভট্টাচার্য ও অবধেশ পাণ্ডে, ভারত স্বাভিমানের পক্ষ থেকে সোমনাথ ব্রহ্মচারী প্রমুখ।

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৭০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

ব্যারাকপুরে রামনবমীতে সশস্ত্র শোভাযাত্রা

সারা দেশের সঙ্গে ব্যারাকপুর সংলগ্ন বিভিন্ন স্থানে শ্রীরামনবমী উৎসব উদযাপিত হয়ে গেল। হিন্দুজাগরণ মঞ্চ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, কোথাও কোথাও স্থানীয় কমিটি তৈরি করে মর্যাদা পুরষোত্তম শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাব তিথি পালন হয়। হালিশহর, নৈহাটী, ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্ট, চন্দনপুকুর (ব্যারাকপুরনগর), টিটাগড়, খড়দা, কামারহাটী, প্রভৃতি স্থানে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় হাজার হাজার মানুষ, বিশেষত মা-বোনেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। হালিশহরে প্রায় তিন হাজার রামভক্তের শোভাযাত্রা শহর পরিক্রমা করে। ব্যারাকপুর ক্যান্টমেন্ট শহরের চিড়িয়া মোড় থেকে কোর্ট, বাসস্ট্যান্ড, মণিরামপুর-সহ বিশাল অঞ্চল গেরুয়া রঙের পতাকায় প্রায় মুড়ে যায়। প্রতিটি বাড়ির ছাদে বজরঙ্গবলীর চিত্র সম্বলিত পতাকা উড়তে দেখা যায়। রামনবমী থেকে হনুমান জয়ন্তীর মধ্যে ব্যারাকপুর শহরে বিভিন্ন স্থানীয় সমিতি দ্বারা নয়টি শোভাযাত্রা বিভিন্ন সময়ে বের হয়। প্রায় সবকটি শোভাযাত্রায় ঘোড়ার গাড়িতে শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, সীতা, হনুমান-সহ বিভিন্ন জীবন্ত ট্যাবলো দেখা যায়। হিন্দু জাগরণ মঞ্চের সবচেয়ে বড় অনুষ্ঠানটি হয় টিটাগড় শহরে। প্রায় সাড়ে তিন হাজার রামভক্তের সশস্ত্র, সুসজ্জিত শোভাযাত্রা হিন্দু জনমানসে উৎসাহ ও সাহসের সঞ্চার করে। ঘোড়ায় টানা বিভিন্ন রথে শ্রীরামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, সীতামাতা, হনুমান ও বালকরা বানরসেনা সেজে ছয় কিলোমিটার রাস্তা পরিক্রমা করে। টিটাগড়ের এই শোভাযাত্রায় প্রায় পাঁচ শতাধিক মায়েদের উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। হনুমান জয়ন্তীতে ব্যারাকপুর স্টেশনের হনুমান মন্দির থেকে সহস্রাধিক সংখ্যার একটি শোভাযাত্রায় প্রায় দশ-বারোটি জীবন্ত সুসজ্জিত ট্যাবলো পথ চলতি মানুষের নজর কাড়ে।

রঙ্গম

কমেডি কি কম পড়িয়াছে!

বিকাশ ভট্টাচার্য

এখনকার বাংলা ছবিতে জিমন্যাস্টিক করার মত নাচ আছে, তারস্বরে ধুম-ধাড়াক্কা গান আছে, ঢিসুম-ঢিসুম আছে— নেই শুধু নির্ভেজাল হাসি। শেষ কবে একটা আদ্যোপান্ত হাসির ছবি দেখেছেন মনে করতে পারেন? এখনকার কমেডিয়ানদের কাতুকুতু দেওয়া ভাঁড়ামো একঘেয়ে লাগে না? অবশ্য এরজন্য এইসব শিল্পীদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। সে রকম চিত্রনাট্য কই? অথচ এক সময় আদ্যোপান্ত রোমান্টিক ছবি বা খুব সিরিয়াস ছবিতেও জায়গা থাকতো কমেডিয়ানদের নিজেকে মেলে ধরায়।

প্রমথেশ বড়ুয়ার 'রজতজয়ন্তী' ছবিটার আখ্যানভাগের বেশ অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে কমেডি। নায়িকার দোতলার ঘরে ঢোকার জন্য মই নিয়ে ছোটাছুটি! আজও ছোটপর্দায় 'সাড়ে চুয়াত্তর' দেখালে বসে যাই টিভির সামনে। উত্তম-সুচিত্রার রোমান্সের পাশাপাশি তুলসী চক্রবর্তী আর মলিনা দেবীর অভিনয় দেখে হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যেতো। ছবির সমস্ত ফোকাস কেড়ে নিয়েছেন— এঁরা দুজন। এই তুলসী চক্রবর্তীকেই 'পরশ পাথর'-এ সত্যজিৎ রায় কীভাবে ব্যবহার করেছেন। পাথর পাওয়ার পর শুধু মুখের অভিব্যক্তি ছিল দেখার মতো। যেখানে উনি গয়না হাতে রানিবালা দেবীকে বলছেন, 'আমি দেব না, দেব না...।' ভাবা যায়!

'মাসিমা মালপো খামু'— ডায়ালগ তো এখন একটা 'কাল্ট' হয়ে গেছে। 'সাড়ে চুয়াত্তর'-এ ভানুর সেই অভিনয় কি ভোলা যায়? একসময় 'ভানু-জহর'কে প্রধান ভূমিকায় নিয়ে কত ছবি যে হয়েছে! 'ভানু গোয়েন্দা জহর অ্যাসিটেন্ট', 'যমালয়ে জীবন্ত মানুষ', 'নির্ধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে', 'পার্সোনাল অ্যাসিটেন্ট', 'মিস প্রিয়ম্বদা' 'ভানু, পেল লটারি'— কত নাম করব। এইসব ছবিতে শুধু কমেডিয়ানরা বক্স অফিস মাত করেছেন। 'ভ্রান্তিবিলাস' ছবিতে উত্তমকুমারের পাশে সমানে সঙ্গত করে গেছেন ভানু। 'আশিতেও আসিও না' ছবিতে বৃদ্ধের ভূমিকাও উত্তরে দিয়েছেন শুধু অভিনয়ের গুণে। জহর রায়ের 'ছদ্মবেশী' ছবিতে ড্রাইভারের অভিনয় তো অনবদ্য। ওঁর সংলাপ বলার একটা কায়দা ছিল। বেশ হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে বলতেন। একটা মজা তৈরি হত। জহর রায়কে প্রধান চরিত্রে নিয়ে ছবি হয়েছে 'এ জহর সে জহর নয়'। সত্যজিতের গুগাবাঘার

'গুপী গাইন বাঘা বাইন'-এর একটি দৃশ্য।

'পরশ পাথর' ছবিতে তুলসী চক্রবর্তী

'সাড়ে চুয়াত্তর' ছবিতে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়

'ভানু গোয়েন্দা ও জহর অ্যাসিসটেন্ট-এর একটি দৃশ্য

হাল্লারাজার মন্ত্রীর চরিত্রে জহর রায় আবার এক অন্য মজার সৃষ্টি করেছেন। মুরগীর ঠ্যাং চিবোতে চিবোতে ওঁর 'এতো খাই খাই করো কেন' বা 'যুদ্ধু লেগেছে'— সংলাপ বলা অপূর্ব। এঁরা কিন্তু তখন সিনেমার সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চও কাঁপাতেন।

রবি ঘোষ ছিলেন আর এক জাতশিল্পী। ওঁর অভিনয় নিয়ে কিছু বলা বাতুলতা। উনি যদি শুধু নির্বাক অভিনয় করতেন তাতেও মানুষ হেসে খুন হতেন। ওঁর চোখের চাউনি, মুখ টেপা হাসি বা শুধু হেঁটে যাওয়ার মধ্যেও কমেডি ছিল। সত্যজিৎ রায়ের 'অভিযান'-এ একটা দৃশ্য ছিল দুলকি চালে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, সামনে একটা কি পড়ে আছে। যেতে যেতে একটা লাফ দিয়ে পার হয়ে গেলেন। 'গল্প হলেও সত্যি', 'দোল গোবিন্দের কড়চা' শুধু ওঁকে ভেবেই করা। 'গুগাবাঘা'তে বাঘা চরিত্রে তাঁর বোকা বোকা অভিনয় কি কেউ ভুলতে পারবে? তাঁর অজস্র ছবির প্রতিটির অভিনয় কিন্তু এখনও আমাদের মনে আছে। 'জন অরণ্য' বা 'অরণ্যের দিন রাত্রি' কিংবা 'বসন্তবিলাপে' তাঁর অভিনয় ভাবা যায়?

উৎপল দত্ত যদিও আদ্যন্ত একজন চরিত্রাভিনেতা, তবু তাঁর কমেডি অভিনয় দেখে বোঝা যায় তিনি কত উঁচুদরের অভিনেতা। 'আগন্তুক'-এর মত সিরিয়াস ছবিতেও তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন ব্যাঙ্গাত্মক মজা।

শেষ করি সন্তোষ দত্ত-কে দিয়ে। সন্তোষ দত্তর মুখের মধ্যেই একটা আলাদা মজা ছিল। ওঁর চোখ দুটো যেন কথা বলত। 'ওগো বধূ সুন্দরী'তে উত্তমের পাশে ওঁর অভিনয়ের কথা ভাবুন। কি টাইমিং! আর 'জটায়ু' চরিত্রটা আইকনিক করে দিয়েছেন তিনি তাঁর অপূর্ব না-অভিনয়ের গুণে। কোথাও মনে হয়নি তিনি অভিনয় করছেন। 'হীরক রাজার দেশে' জাদুকরের ছন্দ মিলিয়ে সংলাপ বলা—এক কথায় তাঁকে অন্য এক উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে। এঁদের কথা বললাম, তবে আরও অনেকে যে সময় নিজের প্রতিভার গুণে ছোট ছোট চরিত্রে অভিনয় করেও আমাদের মনে জায়গা করে নিয়েছেন। যেমন, হরিধন, নৃপতি, শ্যাম লাহা, শীতল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অবশ্যই চিন্ময় রায়। অবশ্য একথা স্বীকার করতেই হবে এঁদের অভিনয় বাঙ্ময় হয়েছে এদের মুখের সংলাপে। সেই সংলাপ আজ কোথায়? একবার ভেবে দেখুন, মরুভূমির ওপর দিয়ে যাচ্ছেন গাড়ি করে, এমন সময় দূরবর্তী উটেদের দেখে পাশে বসা তপসেকে জটায়ু প্রশ্ন করছেন, 'আচ্ছা! উট কি কাঁটা বেছে খায়?'

শব্দরূপ-৭০৭ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

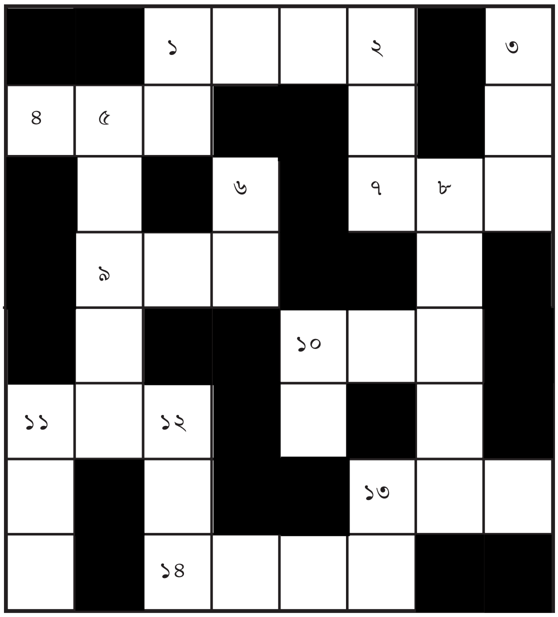

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. মহানায়িকা-অভিনীত বিখ্যাত চলচ্চিত্র; বিবাহের একটি উপসংহার, ৪. 'আজি—জাগ্রত দ্বারে', ৭. দশমহাবিদ্যার এক, রাজরাজেশ্বরী, ৯. দুর্যোধনের মাতুল, ১০. যম, কৃতান্ত, ১১. গঙ্গার বাহন, ১৩. অপরাধীদের অনেক সময় এই ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়, ১৪. ব্যাসের মাতা, ধীবরকন্যা মৎস্যগন্ধা।

উপর-নীচ : ১. হিন্দি প্রতিশব্দে সাধু, ২. সঙ্গীতের রাগ বিশেষ; প্রদীপ, ৩. রাধিকার শাশুড়ি, ৫. যে শপথ করেছে যে জয়লাভ বা মৃত্যু পর্যন্ত যুদ্ধ করবে, ৬. সপ্তাহের বারবিশেষ; এই গ্রহটি অশুভ, ৮. বেদান্ত-বিরোধী প্রাচীন ভারতের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত—শঙ্করাচার্যের সঙ্গে তর্কে পরাজিত, ১০. শিব, ১১. বিষ্ণুর প্রথম অবতার, ১২. প্রাবল্য, হঠাৎকার, বেগ, ১৩. দক্ষকন্যা, ভগবতী।

সমাধান
শব্দরূপ-৭০৪
সঠিক উত্তরদাতা
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯
নিত্যবান মাহাতো
পুরুলিয়া

প্র	হ্লা	দ		প	রি	হা	স
ভু		গ	লু	ই			
	জো	ড়া		তা	র	কা	রি
	ড়া					ল	
	তা					বে	
ব	লি	দা	ন		কা	লা	
			গ	রি	মা		ফ
কো	ক	ন	দ		খ্যা	প	ক

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

□ ৭০৭ সংখ্যার সমাধান আগামী ২ জুন, ২০১৪ সংখ্যায়

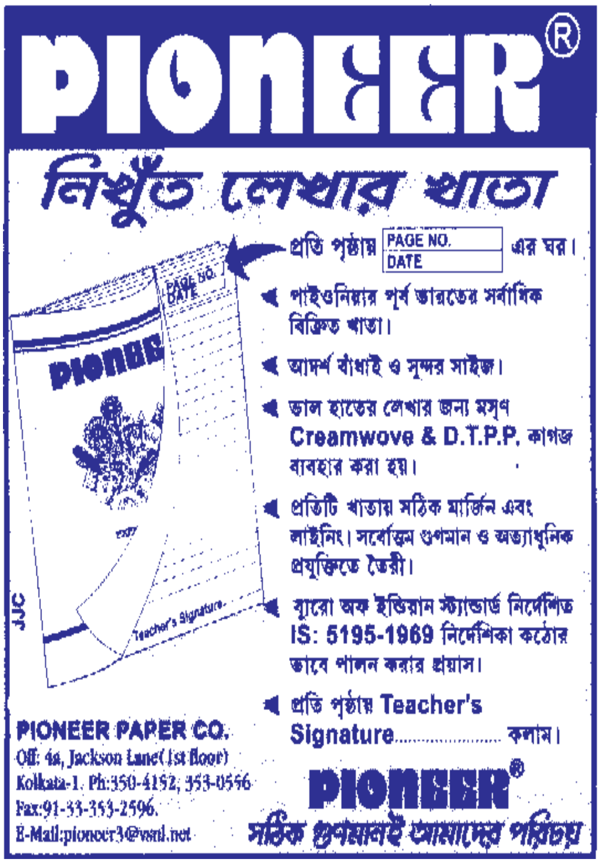

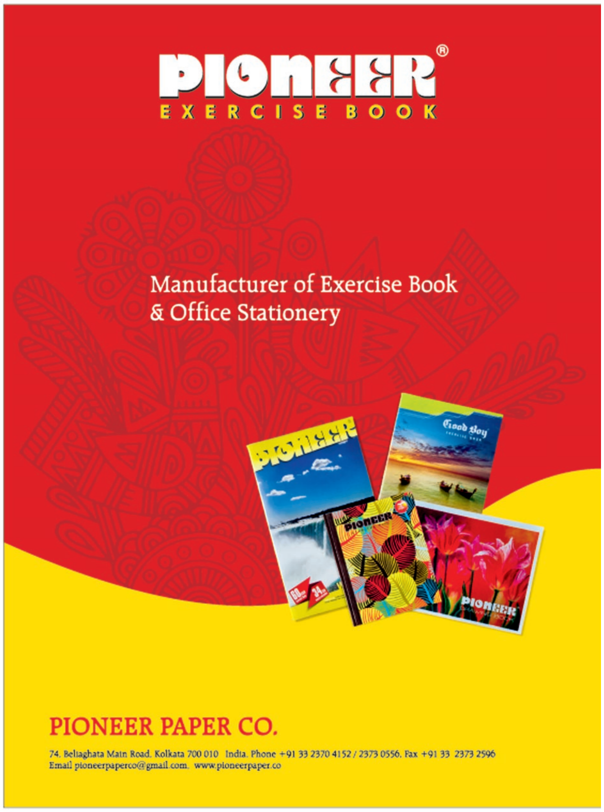

।। চিত্রকথা ।। বিক্রমাদিত্য ।। ২৫

KIND ATTENTION TO HOUSE OWNERS

"WATER SEAPAGE IS A DISEASE LIKE A CANCER
OF YOUR DREAM HOME. REMOVE IT AND SAFE YOUR HOME"

OUR SERVICES :

** Heat & Waterproof Solution for your Heated Roof.
** Waterproof Treatment of Roof, roof Garden Water Tank, Lift Pit, Water Body Etc.
** Leakage, Dampness & Salt Petre Treatment.
** Anti-Termite & Pest Control Treatment

CONTACT :

Calcutta Waterproofing Company

'Park Plaza'

71, Park Street, Room No. 11/12, Kolkata-700 016
98311 85740/9831272657–
emil : roy4258@yahoo.com web : www.calcuttawaterproofing.com

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই
ব্যবহার করুন
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

ALWAYS EXCLUSIVE

Vandana TM
SAREES

Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

সুরেন্দ্র চন্দ্র বসাকের
অত্যাধুনিক গয়নার
ডিজাইনের ক্যাটালগ
সুপার

যে কোন স্বর্ণকারকে দেখাতে বলুন
ক্যাটালগের জন্য যোগাযোগ করুন
9830950831

ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়,
রোদ বৃষ্টিতে কিসের ভয়!

অক্ষয় কুমার পালের
ফোল্ডিং ছাতা
বড়বাজার,কলকাতা-৭০০ ০০৭,
ফোন ঃ ২২৪২৪১০৩

Swastika RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/48/2013-2015
12 May - 2014

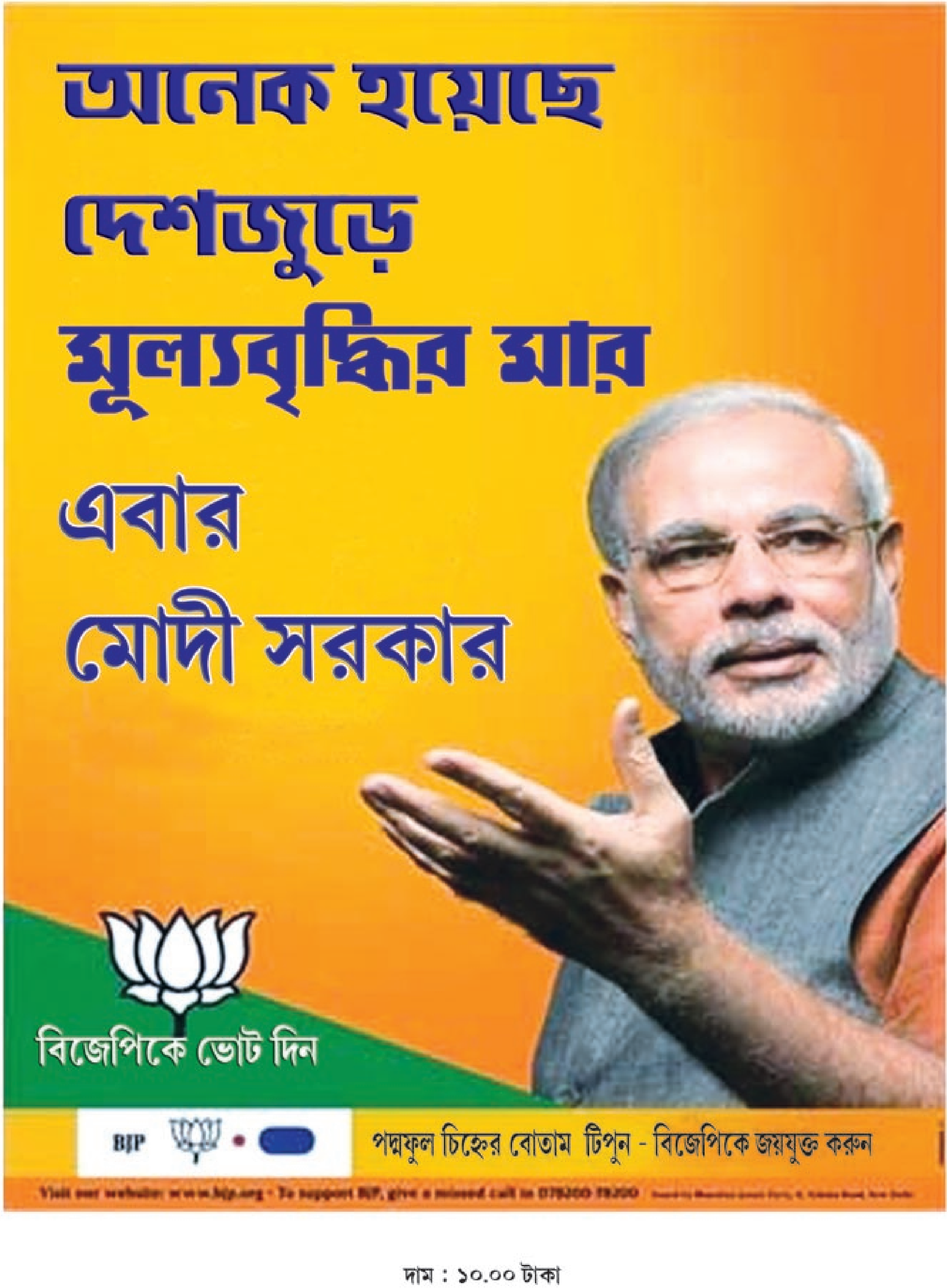

দাম : ১০.০০ টাকা